সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ফেব্রুয়ারি ২০২৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ১০০ সদস্যের বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশনের জন্য একটি ফ্ল্যাগ-অফ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ডেলিগেশনটি ২৫ ফেব্রুয়ারি-৪ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের উদ্দেশ্যে নয় দিনের সফরে যাত্রা করে। অনুষ্ঠানে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম. আর. শামীম ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন আয়োজিত ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট-এসআইডিই ২০২৪-বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ ঢাকাস্থ ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী স্নিয়াভলাং ধর ও মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা যৌথভাবে প্রায় ২০০ বছর আগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী, খাসি পাহাড়ের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ইউ তিরোত সিংয়ের ভাস্কর্য উন্মোচন করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী পোর্ট অফ কলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ ঢাকার হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব ইউনানি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বক্তব্য প্রদান করেন।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫২ | সংখ্যা ০২ | মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩০ | ফেব্রুয়ারি ২০২৪

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু

অন্ধ্র প্রদেশ

স্বাধীন ভারতে ভাষাগত ভিত্তিতে গঠিত প্রথম রাজ্যটি হলো অন্ধ্র প্রদেশ। ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবরে তেলেগুভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য এই রাজ্যটি গঠিত হয়। অন্ধ্র প্রদেশে রয়েছে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদরচনা — বাংলা ভাষার প্রতিরোধ-শক্তি ৩টি ভাষা আন্দোলন ॥ তারিক মনজুর ০৩
জন্মতিথি — নৃত্যে শ্রীচৈতন্যের অবদান ॥ স্বকৃত নোমান ০৬
লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ শ্যামলী ভট্টাচার্য ০৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি — জীবনানন্দের ছোটোগল্প গল্পহীন আখ্যান গদ্য ॥ ঋভু চট্টোপাধ্যায় ১২
চলচ্চিত্র — ঋত্বিক ঘটকের *বুলবুলি* ॥ হিমাদ্রিশেখর সরকার ১৫
বুদ্ধদেবের সিনেমায় ম্যাজিক ॥ মাহমুদুর রহমান ৩৭
ছোটোগল্প — সুরবালার অন্তিম ইচ্ছে ॥ রফিকুর রশীদ ১৭
সংগীত — অনন্তবালা বৈষ্ণবী ॥ গৌতম অধিকারী ২০
পঙ্‌ক্তিমালা — কালীকৃষ্ণ গুহ ॥ সুধীর দত্ত ॥ মিনার মনসুর ॥ মাহমুদ কামাল
দুলাল সরকার ॥ দুখু বাঙাল ॥ সালিম সাবরিন ॥ সোহরাব পাশা
আশিস গোস্বামী ॥ চিত্তরঞ্জন হীরা ॥ জাফর সাদেক ॥ সবুজ তাপস
সিদ্ধার্থশঙ্কর ধর ॥ মাহবুবা ফারুক ॥ মানিক সাহা ॥ রনি অধিকারী
দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম ॥ নাজিয়া ছায়া ॥ সঞ্জয় দেওয়ান ২৪-২৬
ইতিহাস — পূর্ব পাকিস্তানে কাগমারী সম্মেলন
ভারতবর্ষকে তারাশঙ্করের রিপোর্ট ॥ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ২৭
অনূদিত গল্প — নাপিতের ট্রেড ইউনিয়ন : মুল্‌করাজ আনন্দ
অনুবাদ : বদিউর রহমান ২৯
ধারাবাহিক উপন্যাস — বহ্নিলতা ॥ অমর মিত্র ৩৩
কেন্দ্রবিন্দু — অন্ধ্র প্রদেশ ॥ শ্রেষ্ঠা শর্মা ৩৯
অনূদিত কবিতা — গিরধর রাঠির কবিতা ॥ ভাষান্তর : অজিত দাশ ৪২
বিজ্ঞান — মেঘনাদ সাহা ভারতের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী
সন্দীপন ধর ৪৩
উৎসব — ঋগ্বেদে নদী থেকে বাগ্‌দেবী সরস্বতী ॥ সরস্বতী রানী পাল ৪৬

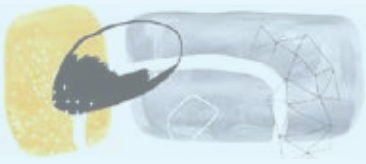

সম্পাদকীয়

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসকেরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ অধিবেশনে তারা উর্দু ও ইংরেজিকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। সে-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকার ছাত্রসমাজ আন্দোলনমুখর হয়ে ওঠে। সে-দাবিতে ১১ মার্চ হরতাল পালিত হয়। বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলী জিন্নাহ 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দেন। ঢাকার সচেতন রাজনীতিবিদ ও ছাত্রসমাজের কঠোর অবস্থান গ্রহণ ও প্রতিবাদে শাসকগোষ্ঠী সাময়িকভাবে তখন অবদমিত হলেও ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঢাকায় এসে আবার একই ঘোষণা দেন। ফলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন পুনরায় দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সে-আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এদিন বাংলার দামাল সন্তানেরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্বঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নামে। আন্দোলনময় সেদিনের মধ্যভাগে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক, শফিক প্রমুখ তেজোদ্দীপ্ত তরুণ। প্রতিবছর ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি বিশেষভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। যে-ঘটনাটি পৃথিবীতে ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গের প্রথম দৃষ্টান্ত তথা বাংলাদেশ ও বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিরল ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের সরকারবিরোধী রাজনীতি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে–যে-আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ সম্প্রসারিত হয়। যা পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অরুণোদয় ঘটাতে সক্ষম হয়।

ঢাকার এই রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন একই সাথে মনে করিয়ে দেয় বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগময় আরও কয়েকটি আন্দোলনকে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয় ব্রিটিশ ভারত। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঙালি মুসলমানদের একাংশ তখন পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে চলে আসে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি হিন্দুদের একাংশ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে চলে যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত উদ্বাস্তু হয়ে এই হিন্দু বাঙালিরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য অবাঙালি রাজ্যে তাদের পুনর্বাসিত করা হয়। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে ছিল ছত্তিশগড়, ওড়িশার দণ্ডকারণ্য, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক। এই পুনর্বাসিত হিন্দু বাঙালিরা এই অবাঙালি-অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে বৈষম্যের সম্মুখীন হয় এবং মাতৃভাষা বাংলার শিক্ষা ও সরকারি মর্যাদার জন্য আন্দোলন শুরু করে। এখানে আসামের বাংলা ভাষা আন্দোলনও স্মরণযোগ্য। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে অসমীয়া ভাষাকে প্রদেশের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে অসমীয়া বাঙালি অধিবাসীগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। সেখানেও বাংলা ভাষা আন্দোলন বেগবান হয়। ফলে সে-আন্দোলন দমন করতে আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকার শিলচর রেলস্টেশনে ১৯৬১ সালের ১৯ মে পুলিশ নির্বিচার গুলি চালায়। তাতে প্রাণ হারায় ১১ জন ভাষাসৈনিক।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জন করেছে। সে-অর্জনের নেপথ্যে দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালামের নাম স্মরণীয়। তারাই প্রথম ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন করেন। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘে এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের জন্ম ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারক। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পর্যন্ত শ্রীহরি নাম ভক্তি ও রাধা-কৃষ্ণের মহামন্ত্র বিতরণ করেন। যার সত্যতা পাওয়া যায়, শ্রীকলিসন্তরণ উপনিষদ ও শ্রীপদ্মপুরাণের হরপার্বতী সংবাদে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে এই কলিযুগে জড়জগৎ থেকে মুক্তির একমাত্র পারমার্থিক পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শ্রী চৈতন্য দেবের প্রতি রইল অতলান্তিক শ্রদ্ধা।

'যত মত তত পথ' এই সর্বজনীন নীতিবাক্য রামকৃষ্ণের মতো এত সহজভাবে আর কেউ বলেননি। তিনি ছিলেন সকল ধর্মকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেখার পথপ্রদর্শক, কোনো ধর্মের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেননি। তিনি বাঙালি সমাজে নতুন আশার সঞ্চার করেন। রামকৃষ্ণের আদর্শ ছিল তাঁর ধর্মকে অভ্যর্থনার সীমানায় সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাখ্যা করা এবং অধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদকে অন্তর্ভুক্ত করা। নবজাগরণের পুরোধা রামকৃষ্ণদেব শুধু আধ্যাত্মিক চেতনা দিয়েই শুরু করেননি, শিক্ষা থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনে তার বাণী ও প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাঁর মতে, মানবজীবনের লক্ষ্য হলো ঈশ্বর-উপলব্ধি। এই ঋষিমানবকে জন্মতিথিতে শ্রদ্ধা।

সকলের কল্যাণ হোক।

প্রচ্ছদরচনা

বাংলা ভাষার প্রতিরোধ-শক্তি
৩টি ভাষা আন্দোলন

তারিক মনজুর

বাংলা ভাষার প্রতিরোধ-শক্তি বিস্ময়কর। মধ্যযুগের সাড়ে পাঁচশো বছরের মুসলিম শাসন এবং আধুনিক যুগের দুইশো বছরের ব্রিটিশ শাসন অতিক্রম করেও এই ভাষা দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরাজ করছে। অথচ পৃথিবীর ইতিহাস বলে, দীর্ঘদিনের শাসনের ফলে শাসকের ভাষা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকেও ধ্বংস করে দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান পর্তুগিজ ভাষা ও হিস্পানি ভাষা এর প্রমাণ। ভাষা-আধিপত্যের এমন নমুনা অনেক আছে।

বাংলা ভাষা ঠিক কবে থেকে মানুষের মুখের ভাষা হয়েছে, তার ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় হয়তো দুরূহ। সংস্কৃত ভাষা যে কালে ছিল ধর্ম ও সাহিত্যচর্চার বাহন, প্রাকৃত ভাষা সেকালে ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। এই প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি–ভাষা-পণ্ডিতেরা এখনো পর্যন্ত তা-ই মনে করেন। বাংলা ভাষার গৌরব এখানেই যে, সে লিপি নিয়েছে সংস্কৃত ভাষা থেকে এবং শব্দ নিয়েছে তার আশপাশের প্রতিটি ভাষা থেকে; কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্যকে কখনো সঁপে দেয়নি

বাংলা ভাষার পরাক্রমের পিছনে দুটি বড়ো কারণ রয়েছে। প্রথমত, সাধারণ মানুষের মুখ থেকে তা কখনো সরে যায়নি। দ্বিতীয়ত, এই ভাষার রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য। এর বাইরে আরেকটি কারণ উল্লেখ করা যায় : বাংলাভাষী মানুষ তার পরিচয়ের চিহ্ন মনে করে বাংলা ভাষাকে। তাই ভাষার ওপর যেকোনো ধরনের আঘাত সে বুক পেতে মোকাবিলা করেছে।

পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সাল পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। এর আগে থেকেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, নবগঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। তবু উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পূর্ববাংলার মানুষ এর বিরোধিতা করে।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১ বা ২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে এই সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস একটি পুস্তিকা বের করে যার নাম ছিল 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা : বাংলা না উর্দু?'। পুস্তিকায় প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদের লেখা ছাপা হয়।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিস 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ডিসেম্বর মাসে করাচিতে জাতীয় শিক্ষা সভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন, সরকারি কাজে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ রাখতে হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি এ নিয়ে গণপরিষদে আলোচনা হয়। খাজা নাজিমুদ্দিন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বিরোধিতায় সংশোধনীটি গণপরিষদের ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও জগন্নাথ কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ক্লাসবর্জন কর্মসূচি পালন করে। ২৯ ফেব্রুয়ারি তারা ধর্মঘট পালন করে। পুলিশ এ দিন ছাত্রদের মিছিলে লাঠিচার্জ করে এবং অনেক নেতাকর্মীকে আটক করে নিয়ে যায়।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে তমদ্দুন মজলিস ও মুসলিম ছাত্রসমাজের এক যৌথসভা হয়। সেই সভায় শামসুল হককে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ওই বৈঠকে ১১ মার্চ ধর্মঘটের আহ্বান করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয় সমগ্র পূর্ববাংলায়।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ঢাকার দুটি সভায় বক্তৃতা করেন। দুই জায়গাতেই তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। জিন্নাহর বক্তব্য তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে।

এরপর নানা ঘটনা পরিক্রমায় ১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে থাকে। ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি পল্টন ময়দানের জনসভায় বলেন, 'প্রদেশের সরকারি কাজকর্মে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু।' সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করে।

৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ওই সময়ে সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সরকার ওই দিন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়। সারা দিন অনেক আলোচনার পর অপরাহ্নে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। ছাত্ররা তবু গণপরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পুলিশ তখন মিছিলের ওপর গুলি চালায়। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত শহিদ হন। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে আবদুস সালাম দেড় মাস পর মারা যান।

পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল গণবিক্ষোভ কর্মসূচি। জনতা নিহতদের গায়েবানা জানাজা পড়ে এবং শোকমিছিল বের করে। মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি পুনরায় লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট চালায়। এতে শফিউর রহমান, আবদুল আউয়ালসহ কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন। বিক্ষোভ মিছিলে মো. অহিউল্লাহ নামে আট-নয় বছরের এক শিশুশ্রমিকও শহিদ হন।

ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলে ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা নির্দেশিত হয়। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারি করে। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

আসামে ভাষা আন্দোলন

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে অসমিয়া ভাষাকে প্রদেশের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। অসমিয়াভাষী মানুষ বাঙালি অধিবাসীদের আক্রমণ করে। জুলাই ও সেপ্টেম্বরে সহিংসতা চরম আকার ধারণ করলে ৫০ হাজার বাঙালি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যায়। আরও ৯০ হাজার বাঙালি বরাক উপত্যকা ও উত্তর-পূর্বের অন্য জায়গায় সরে যায়।

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা অসমিয়াকে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক রণেন্দ্রমোহন দাস এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।

বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ওপর অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ১৪ এপ্রিল তারিখে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির মানুষ সংকল্প দিবস পালন করে। বরাকের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই পরিষদ ২৪ এপ্রিল একটি দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করে। ২ মে সেই পদযাত্রা শেষ হয়। পদযাত্রায় অংশ নেওয়া সত্যাগ্রহীরা প্রায় ২০০ মাইল পায়ে হেঁটে উপত্যকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালান।

পদযাত্রা শেষ করে পরিষদের মুখ্যাধিকারী রথীন্দ্রনাথ সেন দাবি তোলেন, ১৩ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। নইলে ১৯ মে হরতাল পালন করা হবে। ১২ মে আসাম রাইফেল, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট ও কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশবাহিনী শিলচরে ফ্ল্যাগ মার্চ করে। ১৮ মে আসাম পুলিশ আন্দোলনের তিন নেতা নলিনীকান্ত দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন ও বিধুভূষণ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে।

১৯ মে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে হরতাল হয়। হরতালের দিন করিমগঞ্জে আন্দোলনকারীরা সরকারি কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন ও কোর্টে পিকেটিং করেন। শিলচরে তারা রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহ করেন। বিকেল ৪টার ট্রেনের সময় পার হওয়ার পর হরতাল শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু বিকাল আড়াইটার দিকে নয় জন সত্যাগ্রহীকে কাটিগোরা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের একটি ট্রাক তারাপুর স্টেশনের কাছ দিয়ে

১৯৪৮ সালে মানভূম জেলার বিভিন্ন স্কুলে বাংলা পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। হিন্দিকে বিহার রাজ্যের আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জেলা কংগ্রেসের মুখপত্র 'মুক্তি' পত্রিকায় এর প্রতিবাদে ৮ মার্চ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালের ৩০ মে পুরুলিয়ার অধিবেশনে মানভূমকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবটি ৪৩-৫৫ ভোটে খারিজ হয়। তখন অতুলচন্দ্র ঘোষসহ ৩৭ জন জেলাকমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা ১৪ জুন 'লোক সেবক সংঘ' তৈরি করেন। বিহার সরকার বাংলাভাষীদের প্রতিবাদসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করলে মানভূম জেলায় আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠতে থাকে

যাচ্ছিল। আন্দোলনকারীরা তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে দেখে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ভয় পেয়ে পুলিশ বন্দিদের রেখে পালিয়ে যায়।

এর খানিক পর স্টেশনের সুরক্ষায় থাকা প্যারামিলিটারি বাহিনী বিক্ষোভকারীদের বন্দুক ও লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে। এরপর মিনিট সাতের মধ্যে তারা ১৭ রাউন্ড গুলি চালায়। অনেক মানুষের দেহে গুলি লাগে। তাদের মধ্যে সে দিনই নয় জন শহিদ হন। পরদিন আরও দুজন শহিদ হন। এঁরা হলেন কানাইলাল নিয়োগী, চন্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ ও কমলা ভট্টাচার্য।

এই ঘটনার পর আসাম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এরপর ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট সেবা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন করিমগঞ্জের বিজন চক্রবর্তী। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবিতে আন্দোলন করে শহিদ হন করিমগঞ্জের জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস।

মানভূমে ভাষা আন্দোলন

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিহার সরকার রাজ্যে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালে মানভূম জেলার বিভিন্ন স্কুলে বাংলা পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। হিন্দিকে বিহার রাজ্যের আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জেলা কংগ্রেসের মুখপত্র 'মুক্তি' পত্রিকায় এর প্রতিবাদে ৮ মার্চ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯৪৮ সালের ৩০ মে পুরুলিয়ার অধিবেশনে মানভূমকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবটি ৪৩-৫৫ ভোটে খারিজ হয়। তখন অতুলচন্দ্র ঘোষসহ ৩৭ জন জেলাকমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা ১৪ জুন 'লোক সেবক সংঘ' তৈরি করেন।

বিহার সরকার বাংলাভাষীদের প্রতিবাদসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করলে মানভূম জেলায় আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। 'লোক সেবক সংঘ' বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও মানভূমকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার দাবিতে মোট তিনটি আন্দোলন পরিচালনা করে : ক. ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন, খ. হাল-জোয়াল সত্যাগ্রহ আন্দোলন, এবং গ. ১৯৫৪ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

'৫১ সাল পর্যন্ত চলা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অতুলচন্দ্র ঘোষসহ অনেককে কারাবরণ করতে হয়। ওই সময়ে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন রাঘব চর্মকার।

হাল-জোয়াল সত্যাগ্রহের সময়ে বিহার সরকার সব জায়গায় হাল, জোয়াল, মই ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি বন্ধ করে দেয়। প্রতিবাদ হিসেবে 'লোক সেবক সংঘ' চাষিদের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে শুরু করে। এই কর্মসূচি হাল-জোয়াল সত্যাগ্রহ নামে পরিচিতি পায়।

১৯৫৪ সালের টুসু সত্যাগ্রহের সময়ে সাধারণ জনগণ মানভূমের টুসু গানকে প্রতিবাদের উপায় হিসেবে বেছে নেয়। তারা ৯ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টুসু সত্যাগ্রহ শুরু করে।

হেমচন্দ্র মাহাতোর নেতৃত্বে ৯ জানুয়ারি রঘুনাথপুরে 'লোক সেবক সংঘে'র সদস্যরা শহর পরিক্রমা শুরু করে। বিহার সরকার নিরাপত্তা আইনের অজুহাতে ওই সময়ে ৮ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করে। ১০ জানুয়ারি ১১ জন আন্দোলনকারী টুসু গান গাওয়ার সময়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। অতুলচন্দ্র ঘোষ ১২ জানুয়ারি সরকারি বাধা উপেক্ষা করে টুসু গানে পুরো মানভূমকে মুখরিত করার নির্দেশ দেন। এরপরই মানভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে টুসু সত্যাগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে। বিহার সরকার তখন আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া শুরু করে। এর প্রতিবাদে ২২ জানুয়ারি লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও ভজহরি মাহাতো, ২৫ জানুয়ারি সমরেন্দ্রনাথ ওঝা, কালীরাম মাহাতো ও ভাবিনী দেবী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন।

বিহার পুলিশ ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে টুসু দলের ৪০ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করে। ১১ মার্চ পুলিশ মধুপুর গ্রামের 'লোক সেবক সংঘে'র অফিস ভাঙচুর করে এবং প্রচুর টুসু গানের বই বাজেয়াপ্ত করে। এছাড়া, সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ২১ মার্চ মানবাজারের পিটিদারী গ্রামে সত্যাগ্রহীদের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং ১৯৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার উভয় রাজ্যকে যুক্ত করে পূর্বপ্রদেশ নামে এক নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে তাঁরা বলেন, প্রদেশের ভাষা হবে বাংলা ও হিন্দি। বিহার বিধানসভায় ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবটি পাশ হয়।

লাবণ্যপ্রভা দেবী ও অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালে ২০ এপ্রিল হাজার হাজার মানুষ মানভূমকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা ও পূর্বপ্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করে পদযাত্রা শুরু করে। এই পদযাত্রা পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রামে শুরু হয়। পদযাত্রায় সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যোগ দেয় হাজার হাজার মানুষ। মানভূমের টুসু গান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান গেয়ে মিছিল নিয়ে এগোতে থাকে অংশগ্রহণকারীরা।

টানা ১৭ দিন ৩০০ কিলোমিটার পদযাত্রা শেষ করে মিছিল কলকাতায় এসে পৌঁছায় ৬ মে। কলকাতায় পদযাত্রা শেষ হলে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের গ্রেফতার করে। সত্যাগ্রহীদের দ্বারা ৭ মে মহাকরণ অবরোধ করা হয় এবং ৯৬৫ জন স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। প্রায় ১২ দিন কারাগারে আটক রাখার পরে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

এই আন্দোলনের ফলে ১৯৫৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর ভারত সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করে। কমিশন মানভূম জেলা থেকে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার সাথে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি থানা নিয়ে পুরুলিয়া জেলা গঠনের প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পুরুলিয়া জেলা গঠিত হয়। এর ফলে মানভূম ভেঙে তিন টুকরা হয় এবং মানভূমের ভাষা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তারিক মনজুর
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জন্মতিথি

নৃত্যে শ্রীচৈতন্যের অবদান

স্বকৃত নোমান

কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, নৃত্যেও রয়েছে শ্রীচৈতন্যের অবদান। চৈতন্যদেব তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের নিয়ে যে কীর্তন করতেন তাতে নাচও থাকত। প্রসঙ্গত, চৈতন্যদেবের উপাস্য ছিল রাধা-কৃষ্ণ। তিনি রাধাকৃষ্ণের জীবাত্মা-পরমাত্মার তত্ত্বকে গ্রহণ করে 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের' কথা বলেন। কৃষ্ণের 'হ্লাদিনী' বা 'আনন্দদায়িনী' শক্তির মানবীরূপ হচ্ছে রাধা। সুতরাং মূলে উভয়ে অদ্বৈত, কিন্তু দেহরূপে দ্বৈত; পুনরায় অদ্বৈত বা একাত্ম হওয়ার জন্যই তারা মর্ত্যলীলা করেন। প্রেম ও ভক্তি দিয়ে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমসাধনা একাত্ম হওয়ার সাধনা। এজন্য তা 'দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব' নামে পরিচিত। এ তত্ত্বের উপলব্ধি ও সাধনা সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য নয় বলে একে 'অচিন্ত্য' বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের কীর্তনের বিকাশমান পর্যায়ে এসে 'নগরসংকীর্তন' একটি আবশ্যকীয় ধর্মীয় কর্ম হিসেবে রূপলাভ করেছিল। ঢোল, করতাল, মৃদঙ্গ, মন্দিরাসহ নৃত্যগীতে এ কৃষ্ণভক্তি মিছিলসহ নবদ্বীপের পথঘাট মুখরিত করে তুলত

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে নদীয়ার কাজী ও চৈতন্যের সেই ঘটনাটি। শিষ্যদের নিয়ে রাতভর খোল-করতাল আর মৃদঙ্গ বাজিয়ে নেচে নেচে কীর্তন করতেন শ্রীচৈতন্য। তখন বন্ধ রাখা হতো ঘরের দরজা, যাতে কেউ হুট করে ঢুকতে না পারে। কীর্তনের শব্দে আশপাশের মানুষজনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত বলে একদিন তারা নালিশ করল কাজীর দরবারে। নদীয়ার শাসক চাঁদকাজী ছিলেন চৈতন্যের দাদু নীলাম্বর চক্রবর্তীর বন্ধু। নীলাম্বরকে তিনি কাকা ডাকতেন। নীলাম্বরের কথা ভেবে নালিশ আমলে নিলেন না তিনি। কিন্তু যেদিন তার কর্মচারী নালিশ নিয়ে এলো সেদিন আমলে না নিয়ে পারলেন না। সন্ধ্যায় সদলবলে বের হলেন অভিযোগ তদন্তে। নদীয়ার বিস্তর ঘরে তখন খোল-করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিয়ে উচ্চৈস্বরে কীর্তন চলছিল। তিনি ঢুকে পড়লেন এক বাড়িতে। কীর্তুনিয়ারা যে যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচল। যারা ধরা পড়ল তারা অপমান-অপদস্থ হলো। একটা মৃদঙ্গ ভেঙে দিয়ে কাজী সাবধান করে দিলেন, তার বারণ অমান্য করে ফের যদি কেউ কীর্তন করে, তাকে ভোগ করতে হবে কঠিন সাজা। নষ্ট করে দেওয়া হবে তার জাত-ধর্ম।

এই ঘটনায় ভেঙে গেল চৈতন্যভক্তদের মন। তারা ছুটে গেল গুরুর কাছে। শুনে তো চৈতন্যদেব রেগে আগুন। কীর্তন বন্ধ করছেন কাজী! এত ক্ষমতা তার! তাই যদি হয় তবে আগে আমার কীর্তন বন্ধ করুক। দেখি তার কত শক্তি। আজই আমি কীর্তন করতে করতে নগরে ঘুরে বেড়াব। তোমরা সবাই থাকবে আমার সাথে। হাতে একটা করে প্রদীপ নিয়ে বিকালে চলে আসবে আমার বাড়ির সামনে।

সাড়া পড়ে গেল গোটা নদীয়ায়। শত শত ভক্ত হাজির হলো চৈতন্যের বাড়ির সামনে। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল হাজার হাজার প্রদীপ, সাজানো হলো আমপাতা আর কলাগাছের ঘট। লাখো কণ্ঠের হরিধ্বনিতে কেঁপে উঠল নদীয়া নগর। চৈতন্যকে ফুল-চন্দন দিয়ে সাজানো হলো মনোহর বেশে। গলায় মালতীর মালা, মাথায় মোহনচূড়া, পরনে পাটের কাপড়, কপালে চন্দনতিলক আর পায়ে নূপুর। সাজগোজ শেষে মহাসমারোহে যাত্রা করলেন চৈতন্য। বেজে উঠল মঙ্গলবাদ্য। চৈতন্য ও তাঁর ভক্তরা শুরু করলেন নৃত্য-গীত। কেউ আর থাকতে পারে না ঘরে। শত্রু-মিত্র সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখতে থাকে বিশাল কীর্তন-মিছিল। এমন মিছিল কেউ কোনো দিন দেখেনি। রাস্তায় তিল রাখার জায়গাটুকু নেই, ভক্তদের মুখে হরিনাম ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

জনবিদ্রোহ ভেবে ঘাবড়ে গেলেন চাঁদকাজী। সৈন্যদের হুকুম দিলেন, জলদি বের হও। ওদের ঠেকাও। সৈন্যরা গিয়ে আগলে দাঁড়াল পথ। কিন্তু উজানী ঢলকে কি বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায়? মুহূর্তে সৈন্যদের ঘিরে ফেলে কীর্তুনিয়ারা। পালানোর পথ পায় না কেউ। বেগতিক বুঝে চাঁদকাজী লুকিয়ে পড়েন ভেতরঘরে। বাইরে দাঁড়িয়ে চৈতন্য বললেন, 'এ আপনার কেমন ভদ্রতা কাজী সাহেব? আমরা আপনার বাড়ি এলাম, আর আপনি কিনা ভেতরে লুকিয়ে রইলেন!'

ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এলেন কাজী। চৈতন্যকে দেখে তাঁর অবাক লাগে। চেহারায় ঘৃণার কোনো চিহ্ন নেই, রাগের কোনো লেশ নেই; আছে প্রেম ক্ষমা ও দয়ার জ্যোতি। প্রবল প্রতাপশালী চাঁদকাজী লুটিয়ে পড়লেন চৈতন্যের পায়ে। তাঁর বংশের কেউ কোনো দিন হরিনামের বিরোধিতা করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। (দ্র. শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু : অমীয় চক্রবর্তী, তপন প্রকাশন, ঢাকা)

'মৌলভী সুফিরা', যাঁরা ঘূর্ণায়মান দরবেশ নামে পরিচিত, তাঁরা সামার মাধ্যমে মাতম করতেন। কবি রুমির সময়ে তাঁর শিষ্যরা একত্রিত হয়ে সামা গাইতেন ও ঘূর্ণায়মান নৃত্য করতেন। রুমি নিজে একজন সুরকার ছিলেন। তিনি 'রভাব' বাজাতেন, যদিও তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিল বাঁশি। সামার সময় যে সুর সঙ্গী হয় তা হচ্ছে মসনভী এবং দেওয়ান-এ কবির-এর কবিতা বা সুলতানওয়ালাদের কবিতা। সুফিদের মাধ্যমে সামা আসে ভারতবর্ষে। এখনো সুফিদের কোনো কোনো সম্প্রদায় সামাযোগে মাতম করে থাকেন। বৈষ্ণবধর্মে কীর্তন প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেব পদযাত্রাসহ নামসংকীর্তন ও নগরকীর্তন চালু করে এতে নতুন মাত্রা যোগ করেন। নব্য বৈষ্ণবধর্মে সুফি ধর্মমতের আশেক-মাশুক তত্ত্ব, নাম-মাহাত্ম্য, মাতম বা ভক্তিবাদ এবং সামা নাচ-গানের প্রভাব পড়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

মহুয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর গৌড়ীয় নৃত্য গ্রন্থে জানাচ্ছেন, বাড়ির মন্দিরেও শ্রীচৈতন্য কীর্তন করতেন। তিনি যে সংকীর্তন করতেন তাকে বলা যায় 'নৃত্য সংকীর্তন'। তখন বাংলার ঘরে ঘরে এই কীর্তনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য সংকীর্তনে নাচতেন এবং কোনো কোনো সময় 'ধুয়াপদ' গাইতেন। নাচের প্রকার ছিল দুরকম : 'উচ্চণ্ড' ও 'মধুর'। তিনি 'মধুর নৃত্যে'র সঙ্গে ধুয়াগান গাইতেন। মূল গায়েন হিসেবে নয়, দোহার হিসেবে। শ্রীচৈতন্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'নৃত্যসংকীর্তন' হয়েছিল তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলের রথযাত্রায়। তখন বঙ্গদেশ থেকে ভক্তরা মিলিত হয়ে 'মহানৃত্য-সংকীর্তন' করেছিলেন। সেই কীর্তনে শ্রীচৈতন্য যে 'উচ্চণ্ড নৃত্য' করেছিলেন, তা মানুষের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগিয়েছিল। শেষে তিনি 'মধুর নৃত্য' করেছিলেন স্বরূপের গাওয়া এই ধুয়া গান ধরে :

সেই তো পরান নাথ পাইনু
যাহা লাগি মদন দহনে ঝরি গেনু।

রথের সামনে শ্রীচৈতন্যের এই কীর্তন 'পরিমুণ্ডা কীর্তন' ও 'নৃত্য' হিসেবে বিখ্যাত। এই নৃত্যের শুরুতে কীর্তুনীয়াদেরকে সাত সম্প্রদায়ে ভাগ করে একেক সম্প্রদায়ের একেকজন মহাজনকে নৃত্য করতে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করে শ্রীচৈতন্য অনেকবার সংকীর্তন করেছিলেন, যা 'বেঢ়া কীর্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এক প্রভাতি বেঢ়া কীর্তনে শ্রীচৈতন্য সাত সম্প্রদায় নিয়ে নৃত্য সংকীর্তন করেছিলেন। 'উচ্চণ্ড' নৃত্যের শেষে তিনি এই ওড়িয়া পদটি গেয়ে মধুর নৃত্য করেছিলেন :

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই
মনমাতিলা রে চকা চন্দ্রকু গাঞি।

শ্রীচৈতন্য যখন দক্ষিণ ভারতে যান তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন গোবিন্দদাস। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *গোবিন্দদাসের কড়চা* থেকে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হন ত্রিবাঙ্কুর রাজা এবং চৈতন্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভক্তিরস-আপ্লুত নৃত্য করেছিলেন। চৈতন্য যখন ত্রিবাঙ্কুর পৌঁছান, রাজা রুদ্রপতিও তখন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েছিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় উল্লেখ :

কৃষ্ণপ্রেমে যাও প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল দুই বাহু প্রসারিয়া ॥
হরিবোল বোলে গোরা অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥
পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিল।
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিল ॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল ॥

মহুয়া মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, চৈতন্যদেব পুরীতে গিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ আঠারো বছর তিনি নীলাচলেই কাটান। তাঁর পার্শ্বচরদের মধ্যে বক্রেশ্বর, রায় রামানন্দ, কবিকর্ণপুরসহ অনেকেই নৃত্য-গীতে পারদর্শী ছিলেন। ওড়িশি নৃত্যে রায় রামানন্দের অবদান বিপুল। ষোলো শতকে ওড়িশি সমাজ ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ এসেছিল তার মূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্য। ওড়িশির রামানন্দ গোদাবরী নদীর তীরে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রামানন্দের অনুরোধেই চৈতন্য নীলাচলে যান এবং 'মাহারী' অর্থাৎ 'দেবদাসী' নৃত্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তখন প্রচলিত ধর্মীয় ধারা অনুযায়ী 'দেবদাসী' বা 'মাহারীরা' মন্দিরগুলোতে নৃত্য করত, কিন্তু দেবমূর্তির সামনে এই নৃত্য নিষিদ্ধ ছিল দেবদাসীর ঋতুস্রাব চলাকালীন। এই সমস্যার সমাধান করেন শ্রীচৈতন্য। তাঁর 'মধুর রস' উপাসনাতে প্রভাবিত হয়ে সখীভাব বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থির করেন যে, বালকেরা নারীরূপে দেবতার সামনে নৃত্যগীতের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রসার করবে।

শ্রীচৈতন্য 'তৃপদী' বা 'তিরুপতি' নগরে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন রামাত পণ্ডিতরা থাকতেন। তাঁরা শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়ে যান এবং চৈতন্যকে কেন্দ্রে রেখে নৃত্য করতেন। গোবিন্দ দাসের কড়চায় উল্লেখ :

যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া।
নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া ॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ তো নয়।
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুণ্ঠিত হয় ॥

অনেক স্থান পরিভ্রমণের পর শ্রীচৈতন্য কাবেরী নদীর তীরে নাগর নগরে আসেন। সেখানেও সবাই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে নৃত্যগীতে বিভোর হয়েছিল। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য গ্রন্থে তার উল্লেখ :

প্রভুর প্রেমের গতি হেরি পুরবাসী।
আবাল বনিতা সবে হইয়া উদাসী ॥
তিনদিন নৃত্যগীত সেইখানে করে।
এই কথা প্রচারিল নাগর নগরে ॥

পাঞ্জাবের গুরু নানক ছিলেন চৈতন্যের সমসাময়িক। খোদ গুরু নানক পুরীতে চৈতন্যমণ্ডলীর মধ্যে কীর্তন-নৃত্য করেছিলেন। ঈশ্বর দাসের *ওড়িয়া চৈতন্য-ভাগবতে* যার উল্লেখ :

নানক সারঙ্গ এই দুই, রূপসনাতন দুই ভাই ॥
জগাই মাধাই একত্র কীর্তন করন্তি এ নৃত্য ॥

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনকে বলা হয় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ'। মণিপুরি নৃত্যের ক্ষেত্রেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অবদান রয়েছে। শ্রীচৈতন্য যখন নতুন করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার শুরু করেন, তখন সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ প্রায় সারা ভারতকে মুগ্ধ করে। তখন থেকেই এ মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব পরিব্রাজকরা ভারতের পূর্ব প্রান্তে গিয়েছিলেন। এভাবে বাংলা ও আসামের বুক বেয়ে গৌড়ীয় ধর্মপ্রচারকেরা মণিপুরের রাজদরবারে পৌঁছান। কৃষ্ণ ভক্তিরসাশ্রিত এই ধর্মকে মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ স্বাগত জানান। রাজা স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হওয়ায় বেশিরভাগ জনগণ স্বভাবতই একে নিজেদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এবং মণিপুরের জনপদ কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে মুখর করে তোলে। স্বয়ং মহারাজ এই ধর্মে দীক্ষা নেবার পর প্রচলিত রাসনৃত্যের এক নবীনরূপের প্রচার করেন, যার নাম 'নটসংকীর্তন'। তার মানে মণিপুরি নৃত্যধারায়ও শ্রীচৈতন্যের অবদান দেখা যাচ্ছে। পরবর্তীকালে মণিপুরি গুরু ও পণ্ডিতদের অসামান্য অবদানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে নৃত্যশাস্ত্রে সম্পৃক্ত মণিপুরি নৃত্যধারা আরও পল্লবিত হয়েছে।

ভারতের আরেকটি শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা হচ্ছে 'কথক'। কথক নৃত্যের মূল উপজীব্য বিষয় রাধা-কৃষ্ণ লীলা। এই রাধাতত্ত্ব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময় থেকে শুরু হয় এবং চৈতন্যদেব এই রাধাভাবকে দৃঢ়ভাবে ভারতবর্ষে স্থাপিত করেন। অর্থাৎ গোটা বঙ্গ-ভারতে 'রাধাবাদ' চালু হওয়ার পেছনে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বড় অবদান রয়েছে।

'পাঁচালি' হচ্ছে একধরনের গান। মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও চামর সহযোগে নৃত্যসহ পরিবেশিত হতো। নৃত্য-গীত সম্বলিত প্রশ্ন-উত্তরে যে কৃষ্ণলীলা অভিনীত হতো, তার নাম ছিল 'নাট্য-গীত'। গোপাল হালদার তাঁর *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা* গ্রন্থে জানাচ্ছেন, স্বয়ং শ্রীচৈতন্য 'রুক্মিণী হরণ' পালায় রুক্মিণীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল-এ শ্রীচৈতন্যের নাচের কথা পাওয়া যায় যে, শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য রাধারূপে, অদ্বৈত কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যানন্দ বড়ায়িবুড়ি রূপে দানলীলাযুক্ত 'নৌকাবিলাস'-এ নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। শুধু তাই নয়, চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ 'দানলীলায়' নৃত্যাভিনয় করেছিলেন নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে। সনাতন গোস্বামীর *চৈতন্য ভাগবতে* সেই নৃত্যে রূপের বর্ণনা রয়েছে :

কীর্ত্তয়ন্তং মহু: কৃষ্ণং জপধ্যানতরং ক্বচিৎ।
নৃত্যন্তং ক্বাপি গায়ন্তং ক্বপি হাসপরং ক্বচিৎ।

আটচল্লিশ বছর বয়সে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটে। কোথায়, কীভাবে তাঁর দেহাবসান হয় তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। প্রচলিত যেসব গল্প আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে তিনি পায়ে আঘাত পান, আর তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে এখনো চৈতন্যপ্রবর্তিত নগরকীর্তনের প্রচলন আছে। তবে নগরকীর্তন আগে নগর থেকে শুরু হলেও এখন তা 'গ্রামকীর্তনে' পর্যবসিত হয়েছে। বাংলা কার্তিক মাসের এক তারিখ থেকে কার্তিকসংক্রান্তি পর্যন্ত মাসব্যাপী সন্ধ্যার পর শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধসহ পুরুষ ভক্তরা মৃদঙ্গ, কাঁসর, শঙ্খ, করতাল, বাঁশি, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্য-বাজনাসহ পাড়া-মহল্লা-গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন গানসহ কৃষ্ণ-নাম করে। একেই বলে নগরকীর্তন। কীর্তন নিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে পূজামণ্ডপ বা দেব-মন্দিরের সামনের তুলসি গাছের বেদীতে মোম, ধূপবাতি বা ধুপ ও দীপ জ্বালিয়ে দেয় নারীরা। সংকীর্তন বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির নারীরা উলুধ্বনি বা জয়ধ্বনি বা মঙ্গলধ্বনি দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে নগরকীর্তন করা হয়। যখন 'ঝুম' লেগে যায়, অর্থাৎ সবাই যখন গান গাইতে গাইতে আধ্যাত্মিক চেতনায় আত্মহারা হন, তখন সবাই বিশেষ মুদ্রায় নৃত্য শুরু করেন। প্রত্যেকটি গানের প্রায় শেষের দিকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন বাজনা ও গানের কথা আরও উচ্চশব্দে হয়। মহিলারা আবার উলুধ্বনি দিতে থাকেন।

স্বকৃত নোমান
কথাসাহিত্যিক

সুতরাং, শ্রীচৈতন্যের জীবন, সাধন ও বাণী যেমন বাংলা সাহিত্য এবং সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি করেছে নৃত্যকেও।

লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্যামলী ভট্টাচার্য

জন্মতিথি

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মানুষ, ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকা এক ব্যক্তিত্ব, অথচ কেবল আত্ম উপলব্ধি নিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিজের মনকে তিনি কখনো আবদ্ধ রাখেননি। নিজের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা এবং মননকে তিনি প্রসারিত করেছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে।

উনিশ শতকের নবজাগরণের সিংহভাগ ব্যক্তিত্ব ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু অভিজাত পরিবার থেকে আসা। সেই জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র গ্রামীণ পটভূমিকার মধ্যেদিয়ে। তাঁর বা তাঁর পরিবারের কোনো প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ ছিল না বলা যেতে পারে। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও কখনো গ্রহণ করতে চাননি। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া মানুষটিই মানবসমাজের অন্যতম সেরা শিক্ষক হিসেবে নিজেকে কেবল স্বকালেই নয়, ভাবিকালের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন

ভক্তি আন্দোলন, যেটি আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছরেরও বেশি আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে বাংলার বুকে এক জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিভাজনকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পরবর্তী সময়ে নানা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চাপানউতরে, শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার সেই মূল সুরটি অনেক অংশেই অদলবদল হলেও, উনিশ শতকে, ভেদাভেদবিহীন মানবপ্রেমের প্রচার ও প্রসারে, কোনো অবস্থাতেই নিজের ভাবনাকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে, অপরের ভাবনা, অপরের বিশ্বাস, তাকে খাটো করা, এই বোধকে 'মতুয়ার বুদ্ধি', যার ইংরেজি তর্জমা করা হয়েছে 'ডগ্মাটিজিম', সেই বোধ, মানবসমাজে পরিবেশন করবার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাকে ঐতিহাসিক বললেও বোধ হয় খুব কম বলা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়ে মুক্ত বুদ্ধির উন্মেষের যে উদাহরণ রেখে গিয়েছেন, উনিশ শতকে তেমনভাবে নিজেকে বিবর্তিত করে, বিভাজন বিহীন একটা সামাজিক ব্যবস্থার চিন্তা খুব কম মনীষী করেছেন। উদাহরণসহ বললে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে বিষয়টি। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে যখন তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্দিরের পূজারির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন কিন্তু মা ভবতারিণীর ভোগ প্রসাদ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ খেতেন না। যেহেতু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রানি রাসমণি নিম্নবর্গীয় সমাজ থেকে উঠে আসা একজন মানুষ, তাই সেকালের গ্রাম বাংলার যে জাতপাতজনিত সংস্কার, সেই সংস্কারের কারণেই আলাদা করে নিজের হাতে আহার প্রস্তুত করে নিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর এই মানুষটিই নিজের অধ্যাত্ম সাধনার ক্রমবিবর্তনের ভেতর দিয়ে দত্তকুলোৎভব নরেন্দ্রনাথকে বা ঘোষকুলোদ্ভব রাখালকে নিজের মানস সন্তান হিসেবে গোটা সমাজের কাছে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ, পরবর্তীকালের ভুবনজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। আর রাখাল হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থান করে জাতপাতের বেড়ায় কেবল নয়, ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার আবরণ ভেদ করা খুব একটা মুখের কথা ছিল না। সেই সময়ের প্রচলিত ধর্মীয় ভাবধারা এবং সেই ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্বেরা বর্ণবাদকে এতটাই বেশি গুরুত্ব দিতেন যে, নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা প্রাতিষ্ঠানিক দেবদেবতার পূজার্চনা করা তো দূরের কথা, মন্দিরে উঠবার পর্যন্ত অধিকারী ছিলেন না।

অনেক পরে বিশ শতকের মধ্যভাগে নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা, যাদের সেই সময় 'অস্পৃশ্য' বলা হতো, গান্ধীজি তাঁদের নাম দিয়েছিলেন 'হরিজন', আর এই হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের জন্য রীতিমতো সামাজিক আন্দোলন তিনি করেছিলেন, এই আন্দোলন করবার জন্য সেই সময় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বহু বিদ্রুপ-সমালোচনা গান্ধীজির প্রতি বর্ষিত হয়েছিল। এই সময়কালেরও প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মেথরের কাজ করতেন রসিক নামক এক ব্যক্তি, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঈশ্বরানুরাগী, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সেকালে কোনো বর্ণ হিন্দু বা বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব একজন মেথরের বাড়িতে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে খাদ্য-জল গ্রহণ করা এটা যখন ভাবতেই পারত না, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তখন, সমস্ত রকমের সংকীর্ণতাকে হেলায় অস্বীকার করে, রসিকের বাড়িতে যান এবং সেখানে খাদ্য গ্রহণ করেন।

আমাদের মনে রাখা দরকার, শ্রীরামকৃষ্ণ খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ রকমের সতর্ক ছিলেন। কিন্তু সেই সতর্কতা ছিল তাঁর জাতপাত ঘিরে নয়, ধর্ম ঘিরেও নয়। সতর্কতা ছিল যার আনা খাবার বা যার হাত দিয়ে সেটি প্রস্তুত হয়েছে, সেই ব্যক্তিটির যাপন চিত্রজনিত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনুশীলন করলে আমরা দেখতে পাই, সমাজে ব্রাত্য বহু মানুষকে তিনি অহেতুক কৃপা করেছেন। তাঁদের আনা অতি সামান্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে তৃপ্তিসহ খেয়েছেন। কোনো ধনীর আনা মহামূল্য খাদ্যসামগ্রীকে হেলা করে হতদরিদ্র মানুষের আনা অতি সামান্য খাবার, সেগুলো গ্রহণ করেছেন। কিছু মানুষ আছেন যারা অন্ধের হস্তি দর্শনের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের গোটা জীবনের সামগ্রিকতাকে বিচার না করে, একটি-দুটি ঘটনা স্থানিক বিন্দুতে তুলে এনে, তাঁর সম্বন্ধে একটা মূল্যায়ন করে বসেন। যেমন অনেকেই লেখেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কারও হাতে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ন গ্রহণ করতেন না।

এই ধরনের তথ্য যারা পরিবেশন করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের গোটা জীবনের যে কর্মপদ্ধতি, সে সম্পর্কে আদৌ তারা সঠিকভাবে অবহিত নন। ঘোষকুলোদ্ভব, বাগবাজারের বলরাম ঘোষের অন্নকে তিনি, 'শুদ্ধ অন্ন' বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। নিজে বলরামের গৃহে একাধিকবার গিয়েছেন, রাত্রিযাপন করেছেন এবং অন্ন গ্রহণ করেছেন।

ব্যক্তি বলরামের জাত বিচার নয়, তাঁর গোটা জীবনের সৎ যাপনচিত্র এটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বলরাম ঘোষের একমাত্র পরিচয়। ঠিক তেমনি, সাধারণ সামাজিক অবস্থানে অবস্থান না করা, নটী বিনোদিনীকে যেমন থিয়েটার দেখতে গিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, আবার তেমনি জীবনের শেষ পর্বে, শ্যামপুকুর বাটীতে তাঁর অবস্থানকালে, বিনোদিনী যখন সাহেবের ছদ্মবেশে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে আসেন, তখনো শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপা থেকে বিনোদিনী দাসী বঞ্চিত হননি।

যুগ-যুগান্তরব্যাপী প্রবাহিত ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল নিজের ধর্মে সাধনভজন করেই সাধনার পর্বে ইতি টানেননি। অধ্যাত্ম্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব করতে তিনি যেমন খ্রিষ্টান ধর্মে সাধনা করেছেন, তেমনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, ইসলাম ধর্মের যাবতীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে সাধনা করেছেন।

সুফি সন্ত গোবিন্দ রায়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর যে সাধনা এবং যাপন পদ্ধতি, অর্থাৎ; যে মানুষটি তৎকালীন সংস্কারে পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করতেন না, সেই মানুষটিই পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বার কালে, পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী চেতনা, যেটিকে তিনি অত্যন্ত সাধারণ আটপৌরে শব্দ, 'যত মত তত পথ' দিয়ে মানবসমাজে একটা অভিনব চেতনা সৃষ্টি করে গিয়েছেন, সেটি ছাড়াও তাঁর আরেকটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবদান হলো; নারীসমাজকে, একটা সম্মান-মর্যাদার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে যে নিজের জীবনে বা সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, মানুষের ভালো করতে পারার চেষ্টাকে প্রসারিত করতে পারা যায় না–সেই ধারণাকে কেবল তত্ত্বগতভাবে নয়, প্রয়োগগতভাবেও বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী সময়ে বাংলায়, হিন্দু বাঙালির জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তন্ত্রের প্রভাব এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল, যেখানে ঈশ্বর উপাসনা খানিকটা গৌণ হয়ে গিয়ে, তার জায়গা করে নিয়েছিল, বামাচারি সাধন পদ্ধতি। এই ভাবধারার চর্চাতে নারীকে একটা ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখানোটাই, প্রচলিত শাস্ত্রকে অতিক্রম করে, প্রচলিত অভ্যাসে পরিণত করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁর নিজের গোটা সাধনপদ্ধতিতে এবং পরবর্তী সময়ে তার যাপনচিত্রের মধ্য দিয়ে নারীসমাজকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে, প্রবহমান ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার যে অন্যতম মূল সুর, নারীর মর্যাদা, তাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

নিজ পত্নী সারদা দেবীকে কেবল ষোড়শী রূপে পূজা করাই নয়, তাঁর মর্যাদা রক্ষায়, একজন স্বামী হিসেবে গোটা জীবন ধরে যে অসাধারণ ভূমিকা শ্রীরামকৃষ্ণ পালন করে গিয়েছেন, তা সার্বিকভাবে বিশ্বের গোটা পুরুষজাতির কাছে একটি বড় রকমের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করলে বিষয়টা আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে, নিজ পত্নীর প্রতি তথা গোটা নারীসমাজের প্রতি কতখানি সম্ভ্রমপূর্ণ মর্যাদা চিন্তা তিনি বহন করতেন এবং সেই চিন্তাধারা যাতে গোটা বিশ্বের কল্যাণে ধাবিত হয়, সেদিকে নিজের শিষ্য, অনুরাগী, অনুগামীদের পরিচালিত করতেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন একদিন কোনো সাংসারিক প্রয়োজনে কেউ তাঁর ছোট্ট ঘরখানিতে প্রবেশ করেছে। সেদিকে লক্ষ না রেখেই আগন্তুকে উদ্দেশ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করেছিলেন; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী এসেছেন। তাই সেই রকম সম্বোধন তিনি করলেন। কিন্তু এসেছিলেন মা সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে তিনি যখন উত্তরে, 'হ্যাঁ' বললেন।

তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, খুব বড় একটা ভুল তিনি করে

ফেলেছেন। তিনি না বুঝে নিজের পত্নী সারদা দেবীর প্রতি 'তুই' উচ্চারণ করে ফেলেছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি লজ্জায় পড়ে গেলেন। বারবার ক্ষমা চেয়ে সারদা দেবীর উদ্দেশে বলতে লাগলেন; আমি মনে করেছিলাম, লক্ষ্মী এসেছে। অমনটা বলবার জন্য তুমি কিছু মনে করোনিকো।

নিজের ভুল সম্বোধনের জন্য অনুতপ্ত সুরে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কথাগুলো বলতে থাকেন তা শুনে বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়েন মা সারদা। তবু শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলতে থাকেন, তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পত্রী লক্ষ্মী তাঁর ঘরে এসেছে মনে করেই 'তুই' সম্বোধন করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। কিন্তু লৌকিক শিক্ষার যে অনবদ্য মানদণ্ডে তিনি নিজেকে উন্নীত করেছিলেন, তার তুলনা বোধহয় একমাত্র তিনিই। লোকশিক্ষক হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভূমিকা, ধর্মীয় পরিমণ্ডলের ভিতরে যাঁরা তাঁকে বিচার করেন, তার বাইরেও যে মানুষেরা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী নন, এক অর্থে নাস্তিক তাঁদের কাছেও একটা বড় রকমের আদর্শ তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে অধ্যাত্মবাদ ঘিরে বা ধর্মজীবন ঘিরে কখনো, অতিপ্রাকৃত কিছু বিষয়কে নির্ভর করে মানুষ তার জীবন পরিচালিত করুক, এমন কথা একবারের জন্য বলেননি। মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো; ঈশ্বর লাভ। এই বোধের ওপর দাঁড়িয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের জীবনকে যেমন পরিচালিত করেছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর অনুরাগী, অনুগামীদের জীবন ও পরিচালিত হোক বা আগামী দিনে যাঁরা তাঁর ভাবাদর্শকে ভালোবাসবেন, বিশ্বাস করবেন, তাঁরাও ঠিক সেভাবে তাঁদের জীবনকে পরিচালিত করুক–এটাই তিনি চেয়েছিলেন।

সাধারণভাবে বিশ্বাসী মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক ব্যক্তি মানেই বিশেষ কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী এমনটাই ধরে নেওয়ার রেওয়াজ আছে। সেদিক থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সার্বিকভাবে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। নিজের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ নরেন্দ্রনাথ, যখন পিতার অকাল মৃত্যুর পর কার্যত অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন বিধবা মাতা ও ছোট ভাইদের নিয়ে, তখনো কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, কোনো অতিপ্রাকৃত বিষয়ের ভেতর দিয়ে নরেন্দ্রনাথের গৃহের অর্থাভাব পূরণ করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখান নেই।

সাধারণভাবে মানুষ সাধু-সন্তের কাছে যায়, মামলা মকদ্দমা জেতার আশায়, রোগ ভালো হওয়ার আশায়, সন্তান লাভের আশায়। সেই রকম কোনো ভক্তকে তিনি খুশি করে দেওয়ার জন্য নিজের সাধনার অভিমুখকে পরিচালিত করেননি। বরঞ্চ সাধনার জগতে যে সিদ্ধি অর্জন করলে সাধকের মধ্যে কিছু ভোজবাজির ক্ষমতা জন্মায় বলে প্রচলিত ধারণা আছে, সেই সিদ্ধিই শ্রীরামকৃষ্ণ চিরদিন 'বেশ্যার বিষ্ঠা'র মতো ঘৃণ্য বলেই প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন।

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে, নিজের বিজ্ঞাপনের পথে কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্য হাঁটেননি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অনেক প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব, গ্রামের সহজ সরল প্রথাগত শিক্ষার আলোক না পাওয়া এই মানুষটির কাছে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় বারবার মাথা নত করেছেন।

যে বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজ সংস্কারের জন্য গোটা মানবসমাজের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার মানুষ, সেই বিদ্যাসাগরকে তাঁর অসামান্য গুণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তহীন শ্রদ্ধা জানিয়েও, কথা দিয়ে কথা না রাখবার কারণে খুব ক্ষীণ হলেও পরে সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সত্যবাদিতা ছিল একটি বিশেষ রকমের যাপনচিত্রের অঙ্গ। যদি কখনো কোনোভাবে কথার ছলে তিনি কোনো কিছু অঙ্গীকার করতেন, তাহলে সেই অঙ্গীকার রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কখনো কোনো রকম ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণেশ্বরে একবার একজনের বাগানে যাওয়ার তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক সেই প্রতিশ্রুতি তিনি ভুলে যান। কিন্তু যখন তাঁর মনে পড়ে সেই প্রতিশ্রুতির কথা, তখন প্রায় নিশুত রাত। সেই অবস্থাতেই তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাগানে যান। বাগানের বাঁশের দরজাটুকু ঠেলে, ভিতরে নিজের একটি পা প্রবেশ করিয়ে, তিনবার মাটিতে পা ঠেকিয়ে উচ্চারণ করেন; আমি এসেছি, আমি এসেছি, আমি এসেছি।

সত্যবাদিতার প্রশ্নে এমনটাই ছিল তাঁর অঙ্গীকার। এমনটাই ছিল তাঁর যাপনচিত্রের ভঙ্গিমা। তাই বাদুরবাগানে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আসার আমন্ত্রণ জানান, তখন বিদ্যাসাগরমশাই সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার। কিন্তু কার্যত সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেননি।

শ্যামলী ভট্টাচার্য
প্রাবন্ধিক

এই ঘটনাটি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। তাঁর এই আচরণ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, কারও মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য কথা উচ্চারণ করাকে কখনো তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলতেন; সত্য কথাই কলির তপস্যা।

ঘটনাপঞ্জি ❖ ফেব্রুয়ারি

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ ❖ পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্ম
০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ ❖ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ ❖ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ ❖ কবি ও রাজনীতিক সরোজিনী নাইডুর জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ ❖ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ ❖ লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরার জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ❖ দাদাসাহেব ফালকের মৃত্যু
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ ❖ কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ ❖ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ ❖ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ ❖ কথাকার লীলা মজুমদারের জন্ম
২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ ❖ প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের জন্ম

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জীবনানন্দের ছোটোগল্প

গল্পহীন আখ্যান গদ্য

ঋভু চট্টোপাধ্যায়

ছোটোগল্প সাহিত্যের অন্যতম পুরোনো একটি শাখা। এ শাখা নিয়ে আজও আমাদের সব থেকে বেশি আলোচনা হয়ে থাকে। 'বাইবেল' থেকে 'Bkc' অথবা লোকমুখে ঘুরে বেড়ানো কাহিনি বেশ পুরোনো হলেও সাধারণভাবে বলতে গেলে ফরাসি 'conte' এবং 'nouvelle' স্প্যানিস 'novela' ইটালিয়ান 'novella' জার্মান 'novella' এবং kurzgeschichte এর পরে (বলা হয় এই শব্দটি থেকেই ইংরেজি 'শর্ট স্টোরি' শব্দটির অনুবাদ হয়েছে।) আঠারো শতকের দ্বিতীয় অর্ধে ইংল্যান্ডে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ছোটোগল্প। এই প্রসঙ্গে সেই সময়কার বিভিন্ন প্রকাশিত কাগজের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তবে যে বাস্তবধর্মী ছোটোগল্প আমরা বর্তমান সময়ে পড়ি তার জন্ম রাশিয়ায়। অনেকেই বলেন গল্প ও ছোটোগল্প এক নয়, যেখানে গল্প একটি আখ্যান সেখানে ছোটোগল্প এই আখ্যানকে বিশেষ দক্ষতায় প্রকাশ করবার মাধ্যম। বর্তমান সময়ে একটি অন্যতম আলোচনার বিষয় হলো ছোটোগল্পে প্লট থাকবে নাকি শুধু আখ্যানধর্মী কোনো বর্ণনা হবে

রে হার্ভে (Ray Harvey) তাঁর একটি লেখায় প্লট কেন প্রয়োজনীয় বা এটি কিভাবে লেখার সাথে জড়িত সেই সম্পর্কে একটি সুন্দর আলোচনা করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ছোটোগল্পের একটা চলন বা গমন পছন্দ করি। না হলে আমাদের কাছে সেটি গল্প হয় না। এই প্রসঙ্গে অবশ্য অস্কার ওয়াইল্ডের একটি বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে, 'It doesnot matter what you write but how' আমরা যদি ভার্জিনিয়া উল্ফ, জেমস জয়েস বা হেমিংওয়ের ছোটোগল্পের কথা ধরি দেখতে পাব তারা সবাই সম্ভাবনার মধ্যে জীবন আঁকতে ও দেখতে চেয়েছেন। এই শতকে বা তার আগের শতকে মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত আশাহীনতার সাথেই যে সকল প্রতিষ্ঠানকে গুরুমশাই বলে মেনে চলবার বা চালানোর চেষ্টা চলত তাদের বিরুদ্ধে যাবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। গল্পে প্লটের থেকে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের বিষয়ী মনোভাবকেই বেশি করে তুলে দেখানো হয়েছে।

আসলে বর্ণনা হলো শব্দ দিয়ে তৈরি একটা আখ্যানমাত্র। বর্তমান সময়ে ছোটোগল্প একমুখীনতা কাটিয়ে বহুমুখী হয়েছে, হয়েছে গল্পহীন প্লটহীন, জাঁ লুক গোদার চলচ্চিত্রের মতো 'বর্ণনা করা বা কথা বলাটাই হয়ে উঠেছে বিষয়।' ক্যাথেরিন ম্যানসফিল্ডের ভাষায় 'এক শব্দও স্থানচ্যুত নয়, একটি শব্দও বাড়তি নয়।'

হাংরি আন্দোলনের ছোটোগল্পকারদের একটা পরিচিত স্লোগান ছিল, 'গল্পে এখন যারা কাহিনি খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।' এতসব আলোচনার পরেও একটা কথা বলা যায় বর্তমান সময় ছোটোগল্পের মধ্যে জীবনের একটি অংশের সমগ্রতাকে তার নিজস্ব চরিত্র ঘটনা দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিন্যাস করা হয়। গত দেড়শ বছরে এই ছোটোগল্প একটি শিল্পের পর্যায়ে এসেছে। তার নামের জন্যেই ছোটোগল্প আকারে ছোট হবার দাবি রাখে, যদি এই 'গল্প' শব্দটি খুবই আপেক্ষিক কারণ অনেক ধ্রুপদি গল্পই আদপে গল্পহীন, অনেকে বলেন 'পোস্টমাস্টারও' সেই অর্থে ঘটনাবিহীন, দুটি চরিত্র উঠে এসেছে মানবমনের ও অস্তিত্বের সংকট থেকে। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি মতামত গ্রহণযোগ্য, তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমে জীবনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে অনুপুঙ্খভাবে দেখা হয় স্বভাবতই সেখানে জন্ম নেয় উপন্যাস ভারতে জীবনকে যেখানে দেখা হয় সামগ্রিকভাবে সেখানে জন্ম হয় ছোটগল্পের।' বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় ছোটোগল্পকার খুশবন্ত সিংয়ের কথামতো বাইরের দেশেও ছোটোগল্পকে নিয়ে চর্চার পাশে পরীক্ষা করা হয়, তবে আমেরিকাতেই গল্পের বহুমুখীতার পরীক্ষা বেশি।

জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্প আলোচনা করবার আগে এতকিছু আলোচনা করবার একটিই কারণ। যে সময়ে তিনি ছোটোগল্প লিখেছিলেন সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে তার ছোটোগল্পের রূপ ও স্বরূপ কেমন হয়েছে? 'বইমেলা জানুয়ারি' ১৯৯৮ সালে 'প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে প্রকাশিত 'জীবনানন্দসমগ্র' (২) এর সম্পাদকীয়তে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী '১৯৩৩ এর খাতার সংখ্যা ১১ ও ১৯৩৬ এর খাতার সংখ্যা ১০ এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬এর মধ্যে জীবনানন্দের গল্পের পাণ্ডুলিপির খাতার সংখ্যা ৫৩। 'প্রায় প্রতিটি খাতাতেই একাধিক গল্প আছে।' কিছু গল্পে জায়গার উল্লেখ করেছেন তবে বেশিরভাগ গল্পেই তিনি বছরের উল্লেখ করেছেন। এই বইগুলোয় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জীবনানন্দ ১৯৩০ সাল থেকে গল্প লিখতে আরম্ভ করেন এবং ধরে নেওয়া যায় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গল্প লিখে গেছেন। প্রকাশিত গল্পসমগ্রের তথ্য অনুযায়ী তাঁর লিখিত ছোটোগল্পের সংখ্যা ৯৩, উপন্যাস ১০টি কিছু বড়োগল্পও লিখেছেন। স্বভাবতই কিছু গল্প লেখা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এবং কিছু গল্প লেখা হয়েছে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়। ১৯৩০ এর দশকে 'কল্লোল' পত্রিকা মাধ্যমে যে কল্লোল আন্দোলন আরম্ভ হয় সেই আন্দোলনের সাথে জড়িতরা যেসব ছোটোগল্প লিখেছেন জীবনানন্দের ছোটোগল্প মোটামুটি সেই সময়ে লিখিত হলেও সেইসব গল্প কতটা কল্লোল প্রভাবিত সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে জীবনানন্দ যে গল্পহীন বাংলা গদ্যসাহিত্য লিখেছেন (কয়েকটি অবশ্য নিটোল গল্প আছে, যেমন 'কুড়ি বছর পর ফিরে এসে' গল্পটি) বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে যে গল্পহীনতার জন্ম হয় আরও পরে। হাংরি আন্দোলন ১৯৬১ সালে পাটনা শহর থেকে একটি 'ইশতাহার' প্রকাশের মাধ্যমে হয়েছিল, 'নিম সাহিত্য' আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল ১৯৭০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি নিম সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। কবি যখন কথাসাহিত্যে হাত দেন তখন তাঁর দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। কবিকে তাঁর কাব্যভাষা ও গদ্যভাষা সচেতনভাবে আলাদা করতে হয়। জীবনানন্দ দাশ এই দুই ভাষা আলাদা করতে পেরেছিলেন কিনা এ বিষয়ে সমালোচনা আছে। কবি হিসেবে জীবনানন্দ সন্দেহাতীতভাবে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গায়। কিন্তু গদ্যকার হিসেবে তার গদ্যশৈলী পাঠকদের কি আকৃষ্ট করে? অবশ্য পাঠক মনোরঞ্জনের দায় তার নেই। থাকবেই-বা কেন কেউ তাকে বলে দেননি, 'এই ভাবে গদ্য লিখতে হবে।' শোনা যায় জীবনানন্দ নিজেই তার গদ্য ও উপন্যাস প্রকাশ করতে চাননি। হয়তো জীবন সম্পর্কে নৈতিক বোধ জাগানো অথবা তার ক্ষয় সম্পর্কে মানুষের ধারণা তৈরির জন্যেও এই গল্পগুলো রচিত হতে পারে। কোনো লেখক যতটা সংকটে পড়ে ছোটোগল্প লেখেন তার থেকেও বেশি করে লেখেন নিজের শূন্যতাকে ভরাট করতে। অমিয়ভূষণ মজুমদারও এই শূন্যতা বা ট্রমার কথা বলতে গিয়ে পালিয়ে যাবার কথা বলেন, হয়তো বাস্তব পৃথিবী থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া যায় এই তৈরি পৃথিবীতে, নিজের মতো থাকা যায়, ভাবা যায়, নিজের সাথে যোগ কার যায়। তাঁর গল্পের মধ্যে তাই এত নিরাশার কথা লেখা থাকে। 'অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি' গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই একজন উকিল, যার মক্কেল বেশি নেই কিন্তু শুধু গল্প করবার জন্যে কয়েকজন তার বাড়িতে আসত। তাতে লাভ হতো কি? তাই উকিল বলে ওঠেন, 'এ পৃথিবীতে যাদের ভালোবেসেছি তাদের কেউ কেউ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।' জীবনানন্দ দাশ তার লেখা কিছু ছোটোগল্প প্রভাকর সেনকে পড়তে দিয়েছিলেন। উনি অন্নদাশঙ্কর রায়কে আদর্শ করে লিখতে বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার, অনেকে বলেন বাংলা কবিতা যেমন জীবনানন্দের থেকে একটা বাঁক ধারণ করে, বাংলা গদ্যসাহিত্যও হয়তো একইভাবে একটা বাঁক ধারণ করে। বলা হয় জীবনানন্দের 'মাল্যদান' উপন্যাসেই প্রথম চেতনাপ্রবাহ শুরু হয়। জীবনানন্দকে তো কেউ গল্পের প্রচলিত শৈলীতে লিখতে বাধ্য করেনি। তার গল্পের ধারা আমাদের সাধারণ গল্প পাঠের ধারার সাথে মেলে না। মানুষ যেভাবে দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার শিকার হয় সেভাবেই জীবনানন্দের গদ্যেও সেই ঘটনা ফিরে আসে। মানুষের চরিত্র ও মনকে ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে জীবনানন্দের গদ্যশৈলী নির্মিত হয়। তবে আমরা তাঁর গদ্যগুলোতে মনোনিবেশ করলে কতগুলো বিষয় উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর প্রতি গদ্যে মৃত্যুচিন্তার সাথে একটি কেন্দ্রীয় চিন্তা উপলব্ধি করতে পারি। প্রতিটা চরিত্র একটি খাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হয়তো এটাই তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ, উপলব্ধি। 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' গল্পটি চিঠি ও ডায়েরির ভঙ্গিতে রেখা। তাঁর গল্পে কবিতার মতই হতাশা মৃত্যু বিচ্ছেদ এসে যায়, প্রতিষ্ঠিত হয় এক অদ্ভুত মায়াবী পৃথিবী। 'মরচে পড়া লোহার গন্ধ পাই শুধু, গন্ধ পাই মৃত ঘাসের, মৃত মাছির।' (অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি) তাঁর 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পের বিষয়বস্তু একজন মানুষ অনাদি তার যক্ষা হয়েছে যাকে গল্পকার খুব অদ্ভুতভাবে লিখেছেন, 'যক্ষা আমাদের সকলের ভিতরেই একটু আধটু আছে। আমারও আছে, তোমারও আছে।' এই গল্পেও তাঁর মৃত্যু চেতনা বর্ণিত, '–কিন্তু মৃত্যু কি প্রেম নয়?... 'আমার মনে হয় মৃত্যু শান্তি।' অবশ্য শেষকালে উনি বাঁচার কথাও বলেন, ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলেন, 'আমার স্ত্রী, আমার সন্তান যদি শান্তিতে থাকে, তাহলে আমার অসুখও সেরে যাবে লোকনাথ।'

এই গল্পে দাম্পত্য সম্পর্ক থাকে না। 'ব্যক্তির মৃত্যু শেষ করে দিয়ে আজ/ আমরাও মরে গেছি সব।' তাঁর গল্পে নায়করা বেশি কথা বলে। কবি নিজেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক বয়ানের প্রাধান্য বেশি দিয়েছেন। এতে নায়কদের মর্ষকাম প্রকাশিত হয়। 'সঙ্গঃ-নিঃসঙ্গ' গল্পটিকে জীবনানন্দ গবেষক পি. বি. সিলি তাঁর 'আ পেয়েট অ্যাপার্ট' গ্রন্থে যথেষ্ট সংবেদনশীল বলেছেন। আদতে গল্পটি তাঁর নিজের বিয়ের কয়েকদিন পরেই লেখা হয়। গল্পটি জুড়ে প্রেম, বেদনা কাতরতার পরে একাকিত্বই ফুটে ওঠে। সেই সময়কার অর্থনৈতিক দুর্দশার গল্প জীবনানন্দের লেখায় ফুটে ওঠে। কার্ল মার্কস তাঁর 'ইকোনমিক অ্যাণ্ড ফিলোসফিক ম্যানোস্ক্রিপ্ট অফ ১৮৪৪' গ্রন্থে দেখান অর্থ একটি পণ্য। তিনি তাঁর হাইপার রিয়্যালিটির মাধ্যমে অর্থবান লোকেদের অবজ্ঞা করেন। জীবনানন্দ দাশের 'গল্প জাদুর দেশ' আমরা দেখতে পাই মহেন্দ্র নামের একজন কলকাতা থেকে অন্য একজায়গায় একজনের বাড়িতে কাজ করতে আসে। তার মুখে কলকাতা শুনেও কথক বলে ওঠেন, 'আমরা

জীবনানন্দ দাশ ১৯৩২ সালের চৌদ্দই এপ্রিলের দিনলিপিতে সাফাই হিসেবে তিনি লেখেন, ‘আমার গল্প এবং লেখাগুলো প্লটবিহীন, এই অভিযোগ প্রসঙ্গ জীবনটাই তো প্লটবিহীন। কেবল চক্রান্তকারীরাই ষড়যন্ত্র (প্লট করে)।’ এখান থেকে বোঝা যায় কোনো সমালোচনার বিরূপ প্রভাবের জন্যেই এগুলো আড়ালেই রেখেছিলেন। প্রবল অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে তিনি গল্প ছাপানোর জন্যে সাগরময় ঘোষের সাথে দেখা করেন, যদিও লেখা দেননি। হয়তো জীবনানন্দ নিজেই কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সাগরময় ঘোষ জীবনানন্দ দাশের পাঠানো উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে বলেন, ‘উনি বড় কবি কিন্তু ঔপন্যাসিক নয়।’

কলিকাতা চোখেও দেখি নাই। কোনো দিন শীঘ্র দেখিব বলিয়াও মনের ভিতর সুস্বপ্ন গুছাইয়া লইতে গিয়াও থমকাইয়া থাকিতাম।’ আরেকটি গল্পে শচী নামের একটি চরিত্রের মধ্যে কলকাতার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাঁর ছোটোগল্পের বেকার চরিত্ররাও কেউ প্রাইভেট টিউশনি, বা শিক্ষকতা বা সম্পাদনা করত। তাঁর গল্প পড়েই মনে হয় তিনি যেন বারবার বোঝাতে চেয়েছেন অর্থনৈতিক সমস্যা একটি প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যা, তাকে উপেক্ষা করবার শক্তি বাঙালির নেই। এই গল্পেই পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক বিশ্বাসহীনতা ও আমাদের যেভাবে জীবনকে অন্যভাবে দেখতে বাধ্য করে সে ভাবনাও জারিত হয়। মহেন্দ্র তাই বলে, ‘বাপ-মায়ের কাছে তুমি একটি বোঝা ছাড়া কি আর দিদিমণি। থোরাই ভাবে তারা তোমার জন্য।’ উকিল বলে ওঠে, ‘গ্রাম ও শহরের গল্প’ এখানেও পুঁজিবাদ ও গ্রামীণ অর্থনীতির চেতনাপ্রবাহকে গল্পে প্রকাশ করেছেন, আবার ‘মেহগিনি গাছের ছায়ায়’ গল্পে এক বৃদ্ধের মুখে আমরা শুনি, ‘বয়স হল পঁচাত্তরের ওপরে, কিন্তু তবুও সব দেখি সব শুনি, কিন্তু বোবা হয়ে থাকি।’ এই বৃদ্ধ কিন্তু যে সে বৃদ্ধ নন, নীলকণ্ঠ নাম শুনে বলে ওঠেন, ‘আজকালকার বাজারে নীলকণ্ঠ নাম বাজারে চলে–।’ তাঁর কবিতার মতো গল্পের মধ্যেও একরকমের নিঃসঙ্গতাবোধ আছে, যেটি সংসার ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে থাকে। ‘নিঃসঙ্গতার একশ বছর’ উপন্যাসে লাতিন আমেরিকার নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস মাকোন্দো নামের কাল্পনিক স্থানের পটভূমিতে এক আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা রচনা করেছেন, যেখানে যুগের পরিবর্তনে এই নিঃসঙ্গতার সাক্ষী বহন করে। জীবনানন্দের ছোটোগল্পের নিঃসঙ্গতা এক্কেবারে আলাদা। তাঁর কথক বলে, ‘দুপুরবেলা আমি বাস্তবিক বড় একা বোধ করি।’ ‘নিঃসঙ্গতা ভাঙবার জন্য শুধু আসে চাকর, আসে দু-চারটে চড়াই, একটু ঝিম আসে, আরেক পৃথিবীতে হারিয়ে যাই।’ মাঝে মাঝে এই নিঃসঙ্গতা থেকেই উপলব্ধি হয়, ‘এখন এ পৃথিবীতে আমরা যেন অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছি।’ (অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি) এই সমান্তরাল বাস্তব বা পৃথিবীতে হারিয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে থেকেই তাঁর গল্পগুলো একটি যাত্রা হয়ে ওঠে, তারপরেই ক্লান্তে আসে, ‘বরং ঘুমিয়েই পড়ুন চাটুয্যেমশাই, পৃথিবীতে অনেকদিন তো কাটালেন।’ (মেহগিনি গাছের ছায়ায়)। অবশ্য তাঁর গল্পে একটা তীব্র ক্ষোভ ও শ্লেষ থাকে যা গল্পকারের রাগ হতাশাকে প্রকাশ করে। ‘একটি বিড়ালের মতো স্ত্রীলোক বা একজন গাধার মতো বা রাতে বাবলা ও হিজলের মতো মানুষকে বারবার খোশামোদ করতে হবে।’ ‘কিন্তু তবুও যাকে মৃত্যুর শান্তি দিতে পারছি না আমি, না পারছি আমার হৃদয়কে মৃত্যুর মতন শান্তি দিতে।’ (করুণার পথ ধরে)। আবার নিজের চাকরি বা জীবিকার কথা ভেবে লেখেন, ‘জঘন্য জিনিশ এই মাস্টারি... পানের দোকান দেওয়া ভালো।’ (সাধারণ মানুষ) জীবনানন্দের দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল তা আমরা তাঁর গল্প থেকে একটা অনুমান করতে পারি। তাঁর বিয়ে হয় ১৯৩০ সালে। নিভৃতে গল্প লেখা শুরু করেন ১৯৩১ সালে। তাঁর গল্পে বাসর রাতের তিক্ততা, এমনকি বিয়ের আগের প্রেম ও যৌনতার ইঙ্গিত আছে। জানা যায় বিয়ের আগেও জীবনানন্দের সাথে তিনজন নারীর সম্পর্ক ছিল। মনিয়া নামের এক কিশোরী, মামাতো বোন লীলাময়ী এবং কাকা অতুলানন্দের দ্বিতীয় মেয়ে শোভনা, যার ডাক নাম ছিল বেবি। জীবনানন্দ তার নিজের দিনলিপিও তাকে ‘বি-ওয়াই’ বা শুধু ‘ওয়াই’ নামে বর্ণনা করেন। এই মেলামেশা শোভনার মা সরযুবালা পছন্দ করতেন না। জীবনানন্দ কলেজের হোস্টেলে শোভনার সাথে দেখা করতে যেতেন। এই সম্পর্ক যেকোনো অবস্থাতেই পরিণতি পাবে না, এটি জীবনানন্দ জানতেন। অবদমিতভাবে তাঁর লেখায় তাঁর মানসিক যন্ত্রণার কথায় ঘুরে ফিরে আসে, সেটি ‘বিবাহিত জীবন’ গল্পের ‘সতীই’ হোক বা ‘আকাঙ্ক্ষা কামনার বিলাস’ গল্পের কল্যাণী হোক শোভনা তাঁদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। নিজের দিনলিপিতে বিয়ের পরেও শোভনার সঙ্গ কামনা করে, এমনকি চুম্বনও (১৯৩১, ১৫ অগাস্ট)। অসুখী দাম্পত্যের জন্যেই গল্পের চরিত্ররা সব সময় এই প্রেম খুঁজে বেড়াতেন, ‘মেয়ে হোক পুরুষ হোক মানুষের হৃদয়ের সব ভালোবাসাই সব সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে কি?’ (মায়াবী প্রাসাদ)। আবার দাম্পত্য জীবনের ভেতর থাকতে থাকতে যে হাঁপিয়ে ওঠা একঘেয়েমিতা সেসবও লেখেন তীব্র শ্লেষে, ‘তিনি জানেন যে শুধু খাওয়া আর দাওয়া আর সন্তানের জন্ম দেওয়া।’ অথবা ‘চল্লিশ বছরের একটি মেয়েমানুষ, যিনি ছয়-সাতটি সন্তানের মা, তাকে নিয়ে ঘর করা যে কী কঠিন জিনিশ।’ (এক সেতুর ভিতর দিয়ে)।

জীবনানন্দের কাব্যের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য নজরে আসে তা হলো চিত্রধর্মীতা, গল্পের ক্ষেত্রেও তাই। ‘ফিরোজা রঙের মেঘ আকাশের ভিতর তাও এখন আর নেই।’ অথবা ‘অবাক হয়ে দেখছিলাম, আবার সমস্ত ভুলে যাচ্ছিলাম আমি, মেঘ আকাশ আলো শালিখের কলরব, ঘাস...’ (করুণার পথ ধরে), ‘তোমার এক একটা দিনকে আশ্চর্য জাফরান মেঘের মতো সাজিয়ে দিতে।’ (মায়াবী প্রাসাদ)

জীবনানন্দ দাশ ১৯৩২ সালের চৌদ্দই এপ্রিলের দিনলিপিতে সাফাই হিসেবে তিনি লেখেন, ‘আমার গল্প এবং লেখাগুলো প্লটবিহীন, এই অভিযোগ প্রসঙ্গ জীবনটাই তো প্লটবিহীন। কেবল চক্রান্তকারীরাই ষড়যন্ত্র (প্লট করে)।’ এখান থেকে বোঝা যায় কোনো সমালোচনার বিরূপ প্রভাবের জন্যেই এগুলো আড়ালেই রেখেছিলেন। প্রবল অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে তিনি গল্প ছাপানোর জন্যে সাগরময় ঘোষের সাথে দেখা করেন, যদিও লেখা দেননি। হয়তো জীবনানন্দ নিজেই কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

সাগরময় ঘোষ জীবনানন্দ দাশের পাঠানো উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে বলেন, ‘উনি বড় কবি কিন্তু ঔপন্যাসিক নয়।’ আসলে তাঁর গল্পগুলোতে পাঠক এক গোলকধাঁধাতে ঢুকে যান। হয়তো তাঁর উপন্যাস বা গল্পগুলো তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবনের দলিল। তাই সেগুলোকে বাক্সবন্দি করেই রাখতে চেয়েছিলেন অথবা তাঁর নিজের মনেই কোনো সংশয় ছিল।

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য জীবনানন্দ দাশের কবিতা আমরা যেমনভাবে তাঁর প্রয়োজনীয় মূল্য দিতে পারিনি ঠিক তেমনি তাঁর ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও সেই একইভাবে প্রাপ্ত মর্যাদা দিতে পারিনি। ভাবতে অবাক লাগে এখনো অনেকে জানেনই না কবিতার পাশে ছোটোগল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট প্রতিভা ছিল, আমরা সেটার সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ।

ঋভু চট্টোপাধ্যায়
প্রাবন্ধিক

চলচ্চিত্র

ঋত্বিক ঘটকের বুলবুলি

হিমাদ্রিশেখর সরকার

ঋত্বিক ঘটক। একটি নাম–একটি জ্বলন্ত প্রতিভা। বিশ্ববরেণ্য এ চলচ্চিত্রকার জন্মেছিলেন বাংলাদেশেই। জন্ম ঢাকা শহরের ২, ঋষিকেশ দাশ রোডের 'ঝুলন বাড়ি'তে, ৪ নভেম্বর ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে। দেশভাগে বহরমপুর আর কলকাতায় থেকে গেছেন পরিবারের সাথে। 'অযান্ত্রিক'(১৯৫৭-৫৮), 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমলগান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২) ইত্যাদি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বোদ্ধা দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। দীর্ঘ এক দশক বিরতির পর ছবি করতে এলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে

সময়টা ১৯৭২ সালের জুন-জুলাই। তিনি এলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-৫১) 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে। বাংলাদেশে এসে যে ছবিটি করার স্বপ্ন ছিল তার দীর্ঘদিনের। পাকিস্তান আমলে যা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় সে সুযোগ মিলল। যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধা *তরুণ প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান 'পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র'-এর ব্যানারে পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটককে ঢাকায় নিয়ে এলেন। তারও অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল তিনি ঋত্বিক ঘটককে দিয়ে ছবি করাবেন। ঋত্বিক ঘটক তার শ্যুটিংয়ের দলবল নিয়ে উঠেছেন ঢাকায় হোটেল 'পূর্বরাগ'-এ। লম্বা, ছিপছিপে, উশকো খুশকো চুল, অপরিপাটি পোশাক-আশাক, ভাঙাচোরা চেহারা একজন বোহেমিয়ান মানুষ ঋত্বিক কুমার ঘটক। যখন 'তিতাস' করতে এলেন তখন তার বয়স ৪৭ বছর। তখন বয়সের তুলনায় অনেকটাই বুড়িয়ে গেছেন ঋত্বিক। কিন্তু কর্মোদ্দীপনায় তরুণ। তিনি 'তিতাস' করবেন বাংলার জমিনে বাংলার সব অভিনেতা-অভিনেত্রী আর কলাকুশলীদের নিয়ে। এহেন ধারণা ও পরিকল্পনা নিয়েই ঢাকায় আগমন ঋত্বিকের। কলকাতা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন সঙ্গীত পরিচালক ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ সাহেবকে। একসময় তিনি যার কাছে সেতারের তালিম নিতেন। তিনিও বাংলাদেশেরই সন্তান। ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ ও কাহিনিকার অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মস্থান 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী' নামে খ্যাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

ঢাকায় ঋত্বিক তার 'তিতাস'-এর জন্য নতুন মুখ খুঁজছেন। তার সম্পর্কে সমালোচক মহলে একটি কথা চালু ছিল যে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক একটি সদ্যোজাত শিশুকে দিয়েও অভিনয় করাতে পারেন। আড্ডাবাজ ঋত্বিকের ঢাকাতেও অনেক বন্ধু জুটে যায়। তার একটি আড্ডাস্থল ঢাকার শাহবাগস্থ 'বাংলাদেশ বেতার ভবন'। এখানে একদিন তিনি অনুষ্ঠান-

প্রযোজক জালালউদ্দিন আহমেদের কামরার দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে একটি মেয়ের সুন্দর মসৃণ দুটি পা দেখতে পান। ভাবলেন, এমন একজোড়া সুন্দর পাই তো তিনি তার ছবির জন্য খুঁজছেন। ঢুকে গেলেন জালাল সাহেবের কামরায়। তখনো তিনি জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন মেয়েটির দু'পায়ের গোড়ালির দিকে। অবলীলায় জালাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মেয়েটিকে আমার চাই'।

এক হাল্কা পাতলা লম্বাটে, খ্যাপাটে বুড়ো মতন লোকের জুলজুল চোখের চাহনি আর চাঁচাছোলা গলার স্বর শুনে তারই মতো একহারা লম্বা গড়নের সুন্দরী, ছট্‌ফটে, আলাপি, আড্ডাবাজ মেয়েটি প্রথমে চমকে উঠেছিল। পরক্ষণেই প্রবল বিতৃষ্ণায় মনে মনে বলেছিল, 'আঃ, বুড়ো মিন্‌সের কথার ছিড়ি দ্যাখ না।'

মেয়েটি ভাবতে পারেনি যে এ 'বুড়ো মিনসেই' জগৎবিখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক। ঘটকবাবু সেদিন 'বাংলাদেশ বেতার ভবন' থেকে যে মেয়েটিকে তার নির্মাণাধীন 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির একটি চরিত্রের জন্য নির্বাচন করেছিলেন তার নাম সোফিয়া রোস্তম। 'তিতাস'-এর নামি-দামি তারকাদের পাশে নবাগতা সোফিয়া শুধু জায়গা করেই নেননি ছবিতে অন্যতম প্রধান 'উদয়তারা'র চরিত্রে অভিনয় করে ১৯৭৩ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর দ্বিতীয় পুরস্কার জিতে নেন। ছবিটিও ঐ বছরে বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করে। এবং ঋত্বিক ঘটক নিজেও ছবিটিতে তিলকচান মাঝির চরিত্রে অভিনয় করেন। এপিকধর্মী এ ছবিটি বাংলাদেশে মুক্তি পায় ২৭ জুলাই ১৯৭৩-এ। আর ভারতে অনেকদিন পর ১৯৯১-তে।

ছবিতে কাজ করার সময় ঋত্বিক আদর করে সোফিয়াকে 'বুলবুলি' বলে ডাকতেন। সোফিয়া আনন্দের সাথে তার প্রিয় ঋত্বিকদার এ ডাকে সাড়া দিতেন। এ পর্বে আমরা ঋত্বিকের 'বুলবুলি' সম্পর্কে কিছু জেনে নিই।

ফরিদপুরের মেয়ে সোফিয়া। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় রোস্তম নামের এক লোকের সাথে বিয়ে হয়ে যায়। পরে তারা ঢাকায় চলে আসেন। সেটা ১৯৬৬ সালের কথা। বিয়ের পর প্রথমদিকে স্বামী রুস্তম সোফিয়ার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে সেটা শারীরিক-মানসিক অত্যাচারে রূপ নেয়। ফলে ১৯৭৩-এ তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ। সোফিয়ার বাবা ছিলেন অ্যাডভোকেট। তিনিও ঢাকাতেই থাকতেন। দুভাই চার বোনের মধ্যে সোফিয়াই ছিলেন সবার বড়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সোফিয়া আবার স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি সোফিয়া গান ও কবিতা লিখতেন। সে সূত্র ধরেই তার বেতার ভবনে যাওয়া-আসা। আর ওখানেই পেয়ে যান ঋত্বিক দাদাকে এবং শুরু করেন নতুন আরেকটি জীবন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিতে সোফিয়া রোস্তম সাত হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হন। যা এখনকার টাকার মূল্যমানে সাত লাখ হবে (আনুমানিক)। বাংলাদেশে যখন 'তিতাস' নির্মাণ হচ্ছিল একই সময়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনায় কলকাতার আরেক পরিচালক রাজেন তরফদার ঢাকায় নির্মাণ করছিলেন 'পালংক' নামের আরেকটি ছবি। ফরিদপুরের সন্তান বিখ্যাত কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প অবলম্বনে 'পালংক' তৈরি হচ্ছিল। এ ছবিতে বিখ্যাত অভিনেতা উৎপল দত্তের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পান সোফিয়া। দাদা ঋত্বিক ঘটকের অনুরোধেই তিনি বারো হাজার টাকার চুক্তিতে 'পালংক' ছবিতে অভিনয় করেন। ছবির মূল চরিত্রে ছিলেন উৎপল দত্ত ও সন্ধ্যা রায়। 'তিতাস' এর মতো এ ছবিটিও বোদ্ধা দর্শকদের বিপুল প্রশংসা কুড়ায়।

এ দুটি বিখ্যাত ছবিতে অভিনয়ের কারণে চিত্রপাড়ায় তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সোফিয়া রোস্তম একের পর এক ছবিতে কাজ পেতে থাকেন। 'পায়ে চলার পথ', 'কি যে করি', 'হারজিৎ', 'সূর্যদীঘল বাড়ী', 'সুরুজ মিয়া', 'মাটির মায়া', 'সুদাসল' ইত্যাদি ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। তার অভিনীত ছবি ৫০-এরও বেশি বলে জানা যায়। তিনি 'বাংলাদেশ টেলিভিশন'-এও নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন। মোস্তাফিজুর রহমান প্রযোজিত ধারাবাহিক নাটক 'এইসব দিনরাত্রি'-তে (১৯৮৬ সাল) 'মনা' চরিত্রে সোফিয়ার অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে। পাশাপাশি পত্র-পত্রিকাতেও তিনি লেখালিখি করেন।

এ সময়ে সোফিয়া রোস্তম একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রেমে পড়েন। একসময় তার সাথেও ভুল বোঝাবুঝি হয় সোফিয়ার। ফলে ড্রাগ-আসক্ত হয়ে পড়েন তিনি। নিজের ওপর নিজেই অত্যাচার চালাতে থাকেন। কিন্তু তখনো তার প্রেমিককে তিনি সমানে ভালোবেসে চলেছেন। প্রেমিকের দেওয়া একটি লাল টিপ কপালে সবসময় পরতেন। এটি পরতে পরতে তার কপালে একটি সাদা দাগ পড়ে যায়।

আমরা সোফিয়া রোস্তমের হৃদয়বিদারক প্রেমের কাহিনিকে পেছনে ফেলে আবার ফিরে যাব তার প্রিয় ঋত্বিক দাদার কাছে। যেখানে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর ইনডোর ও আউটডোর শ্যুটিং চলছে। যেখানে আদরের সোফিয়া তার প্রিয় ঋত্বিক দাদার 'বুলবুলি'। সেখানে বুলবুলি পাখির মতোই শান্ত তার চলাফেরা। 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'য় (এফডিসি) সোফিয়া যেদিন পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের হাত ধরে প্রথম প্রবেশ করেন সেদিন তার সামনে বাংলাদেশের বাঘা বাঘা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। প্রবীর মিত্র, কবরী চৌধুরী, গোলাম মোস্তাফা, রোজী সামাদ, রওশন জামিল, ফখরুল হাসান বৈরাগী প্রমুখ শক্তিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীর সামনে দাঁড়াতে তার বুক কাঁপলেও সাহস হারাননি সোফিয়া। কারণ পাশে ছিলেন তার প্রিয় ঋত্বিক দাদা। যিনি তাকে অনেক পছন্দ করে তার ছবিতে এনেছেন।

যখন আউটডোর শ্যুটিংয়ে যেতেন তখন দাদা ঋত্বিকের স্নেহ-ভালোবাসা পাবার আশায় দাদার আশপাশে ঘুরঘুর করতেন সোফিয়া। ঋত্বিক দাদা এক ফাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তার প্রিয় বুলবুলির গাল একটি আদরের চড় বসিয়ে দিয়ে বলতেন, 'এই নে তোর সারাদিনের আশীর্বাদ।' 'বুড়ো মিনসের' এহেন কাণ্ডকারখানা দেখে সোফিয়া হেসে গড়িয়ে পড়তেন। আর শ্যুটিং পয়েন্টের অন্যেরা তখন সোফিয়াকে হিংসে করতেন। আর এ হিংসের কারণ বুঝতে পেরে কারণে-অকারণে জেদ ধরে বসে থাকতেন ঋত্বিকের আদরের 'বুলবুলি' সোফিয়া। তার জেদ দেখে শ্যুটিং পয়েন্টের অনেকেই তাকে 'বাঘের বাচ্চা' বলে ডাকতেন।

'তিতাস'-এর কাজ শেষ হলে ঋত্বিক সোফিয়াকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সোফিয়া দেশের মায়া ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। দাদা তার আদরের বুলবুলিকে বলেছিলেন, 'দেখিস তিতাস-এর উদয়তারা তোকে পুরস্কার এনে দেবে।' দাদার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। কিন্তু এসবকিছু দেখার জন্য দাদা আর বেঁচে রইলেন না। ছবির কাজ চলাকালীন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে ঋত্বিক ঢাকার 'মহাখালী যক্ষ্মা হাসপাতাল'-এ ভর্তি হন। একসময় গুরুতর অসুস্থ হলে ভারত সরকার বিশেষ বিমানে তাকে কলকাতায় নিয়ে যান। 'তিতাস' শেষ করার পর তিনি মাত্র আড়াই বছর জীবিত ছিলেন। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার পদ্মশ্রী ঋত্বিক ঘটক ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬-এ কলকাতায় মাত্র ৫১ বছর বয়সে চিরবিদায় লাভ করেন।

২০০৭ সালে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর করা তালিকায় (দর্শক-সমালোচকদের ভোটে) সেরা বাংলাদেশি ছবির মধ্যে সবার উপরে ছিল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। আর ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক-এর তালিকায় প্রথম ৪০টি ছবির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ঋত্বিকের 'তিতাস'।

* পরবর্তী সময়ে হাবিবুর রহমান খান প্রযোজনা করেন 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'হঠাৎ বৃষ্টি', 'মনের মানুষ', 'শঙ্খচিল'সহ আরও অনেক শিল্পশোভন ছবি।

*'তিতাস'-এর আউটডোর শ্যুটিং হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছবির কাহিনিকার অদ্বৈত মল্লবর্মণের গ্রাম গোকর্ণঘাটে। যে গ্রামের পাশেই তিতাস নদী। মেঘনাপাড়ের গ্রাম লালপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), নারায়ণগঞ্জের বৈদ্যের বাজার, ঢাকার সাভার ও মানিকগঞ্জের আরিচাঘাটসহ আরও কিছু স্পটে।

হিমাদ্রিশেখর সরকার
প্রাবন্ধিক

তথ্য সহায়িকা
০১. 'বসুন্ধরা', সম্পাদক : লুৎফর রহমান শাওন। নভেম্বর ১৯৮৬ সংখ্যা, ঢাকা।
০২. 'ঋত্বিকমঙ্গল', সম্পাদক : সাজেদুল আউয়াল। বাংলা একাডেমি, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০১।
০৩. ইন্টারনেট।

ছোটোগল্প

সুরবালার অন্তিম ইচ্ছে

রফিকুর রশীদ

সুরবালা এখন কী করবে!

কেউ কি তার কথায় কান দেয়, নাকি তার নিষেধ-বারণ মান্য করে! সংসারে সে আবার একটা মানুষ! রোগজর্জর থুত্থুড়ে বৃদ্ধা, ঘাটের মড়া বললেই চলে, ছেলে-বউ নাতি-পুতি সবার কাছেই সে এখন দুর্বহ বোঝা; কে গুরুত্ব দেয় তার কথায়! বছরের পর বছর ধরে সে আছে আপন বৃত্তে শামুকের মতো গুটিয়ে। খোলসের মধ্যে ঘাড়মাথা শুঁড় সেঁধিয়ে যাবার পরও শামুকের চোখ খোলা থাকে কিনা সে-কথা সুরবালা দাসীর জানা নেই, তবে ঘরের দাওয়ায় জুবুথুবু হয়ে শুয়ে থাকলেও সে টের পায় তার দুচোখ খোলা। গভীর খোঁড়লের ভেতরে ঢুকে গেছে চোখের মণি, তবু সে অনেক কিছু দেখতে পায়। সব কিছু আলো ঝকঝকে ফকফকা হোক বা না হোক, চোখ মেললে প্রায় সবকিছুই দেখতে পায়, বুঝতে পারে। এমনকি রাতের অন্ধকারে চোখের পাতা মুদে এলেও অনেক ছবি ভেসে ওঠে চোখের আয়নায়। ছবির পর ছবি। গোটা জীবনের কত রকম ছবি! সেই ছবিগুলো অবিরাম দাপায়, দগ্ধায়, তাড়িয়ে ফেরে; বাকি রাত আর ঘুমোতেই দেয় না। তখন আর কীই-বা করার থাকে তার! নির্ঘুম পাড়ি দেয় রাতের প্রহর

একদা খাল পেরিয়ে দুই গ্রামের মানুষ মিলিত হতো গ্রাম্য মেলায় খেলায়, সামাজিক পালাপার্বণে। দুই রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে যাবার পর দুপারের মানুষের মেলামেশার সম্পর্কটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে

কিন্তু ভূতের পালের এই জ্বালাতন আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! অমনি তো আর খিস্তি-খেউড় এসে জিভের ডগায় লকলক করে না, করে ওদের অত্যাচারে। কেন, ওই ডালিমগাছের তলায় পেচ্ছাপ না করলে চলে না তোদের! সারা বাড়িতে আর কোথাও জায়গা পাসনে ভূতের পাল? সুরবালা কোমরের ব্যথায় একবার কঁকিয়ে ওঠার পর মুখে গজর গজর করতেই থাকে–দাঁড়া, আমার মাজার ব্যথা একটু কমুক, সবকটা বাঁদরের নুনু আমি বটি দিয়ে কাটব, হ্যাঁ।

ভূতের পাল বা বাঁদরের পাল যে-নামেই ডাকুক সুরবালা দাসী, ওরা সবাই তার নাতি। দুই পুত্রের সুবাদে চারজন উত্তরাধিকার। ওদের মধ্যে ছোটো-বড়োর কোনো ভেদাভেদ নেই। কেমন খ্যাকখ্যাক করে হাসতে হাসতে জবাব দেয়,

নুনু কাটলে তো আমরা মোছলমান হয়ি যাব, ঠাকমা!

সুরবালা তখনো কটকট করে ওঠে,

হ্যাঁ, মোছলমান হওয়া অতই সোজা!

বালকেরা বেশ বিপন্ন বোধ করে। তাদের এই গোবরডাঙ্গা গ্রামে একঘরও মুসলমানের বাস নেই সত্যি, তবু আশৈশব নানাজনের কানাকানি থেকে হিন্দু-মুসলমানের প্রধান পার্থক্যের ওই স্থূল জায়গাটির কথাই তারা জেনে এসেছে। কিন্তু সুরবালার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা বর্ডারের এপারে মুসলমানপ্রধান গ্রাম তারাপুরে। বলতে গেলে এই তারাপুর আর গোবরডাঙ্গা ছিল একই জনপদ। একটি ছিল হিন্দু-অধ্যুষিত, অন্যটি মুসলমান-অধ্যুষিত। মাঝখানে ট্যাংরামারির খাল। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর সেই খাল বরাবর হয়েছে সীমান্ত বিভাজন।

একদা খাল পেরিয়ে দুই গ্রামের মানুষ মিলিত হতো গ্রাম্য মেলায় খেলায়, সামাজিক পালাপার্বণে। দুই রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে যাবার পর দুপারের মানুষের মেলামেশার সম্পর্কটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কী এক অদৃশ্য কারণে তারাপুরের হিন্দুপাড়ার অধিকাংশ বাসিন্দা রাতের আঁধারে বর্ডার টপকে ধীরে ধীরে গোবরডাঙ্গা কিংবা আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। সুরবালার বাবা নিতাইচরণ দাস মাটি কামড়ে পড়েছিল তারাপুরেই। তার ভাই-ভাইপো ভগ্নিপতি সবাই একে একে কেটে পড়ে ওপারে, তবু সে এক রকম গোঁ ধরেই পড়ে থাকে তার জন্মভিটে আগলে। অথচ একমাত্র কন্যা সুরবালার বিয়ের সময় তার মগজের কোষে জমা হয়ে থাকা ধনুকভাঙ্গা পণ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল কে বলবে সেই কথা! আইবুড়ো মেয়ের বোঝা কি খুবই দুর্বহ হয়ে উঠেছিল! সুরবালার বয়সী অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান যুবকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে জাত কূল হারায়, বিষপানে কিংবা উদ্বন্ধনে প্রাণ জুড়ায়। সে-সব বদনাম ছিল না সুরবালার। সুফিয়া, ফরিদা, আমেনা, সাইফুল, মোস্তফা, এনামুল, জুব্বার–গ্রামজোড়া কত না সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার মাখামাখি। একইসঙ্গে বড় হতে হতে কই, কারও চোখে তো কখনো পাপের ছায়া দেখেনি! একবার মণ্ডলপাড়ার কালাম কুপ্রস্তাব দিতে গিয়ে এনামুল এবং খলিলের হাতে বেশ শায়েস্তা হয়। কিন্তু সেকথা তো অভিভাবকের কানে পৌঁছানোর কথা নয়। অথচ সেবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মাসখানেক আগে গোবরডাঙ্গার কেষ্টদাসের ছেলে বিপিন চোরাপথে বর্ডার টপকে এসে সহসা সুরবালার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই নিতাইচরণ কী ভেবে যে ঘাড়েমাথা দুলিয়ে এককথায় রাজি হয়েছিল, সে ব্যাখ্যা সংসারের কারও পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তারপর এক রাতে স্বামীর হাত ধরে সুরবালা চোরাপথে চলে আসে গোবরডাঙ্গা। পেছনে পড়ে থাকে স্মৃতিঘেরা তারাপুর। মুসলমান-অধ্যুষিত সমাজের অনেক রীতিনীতি, বিধি-বিধান সে বুকে পুষে রাখে, তবু তারাপুরে আর যাওয়া হয় না।

যাবার সুযোগ একবার হয়েছিল একাত্তরে। তখন চারদিকে বর্ডার হাট করে খোলা। তাড়া খাওয়া মানুষ ছুটে আসছে বানের স্রোতের মতো। সেই স্রোতের উজানে কেউ কেউ খানিক এগিয়ে জানপস্তানো লোকজনের খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। সুরবালা কার খোঁজ নেবে? ততোদিনে বাবা-মা দুজনেই সগ্‌গবাসী হয়েছে। ছোটভাই দিলীপ রাতের আঁধারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে হাবুডুবু খেয়ে সহযোদ্ধাদের গুলিতে নিকেশ হয়েছে সেই কবে! না, খতম-লাইনের যোদ্ধারা নাকি গুলির অপচয় অপেক্ষা ধারালো অস্ত্রে জবাই করাকেই উত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচনা করে। তা যে-অস্ত্রেই হোক, দিলীপ সমাজতন্ত্রের নামে প্রাণ উৎসর্গ করেছে, এ খবর সিপিএমের চ্যালাদের কাছ থেকে অনেক আগেই জেনেছে সুরবালা। তাহলে আর স্রোত উজিয়ে কার জন্যে যাবে সীমান্তের ওপারে! আর যাই বললেই কি যাওয়া যায়! তার কোলে তখন পিঠোপিঠি দুই ছেলে অখিল আর নিখিল। ওরা যে-রকম মা-ন্যাওটা, ওদের ফেলে কোথাও দুদণ্ডের জন্যে পা-বাড়ানোর জো আছে!

তবু একবারের জন্য তারাপুরে যাবার খুব সাধ হয় তার। সেটা ঠিক জন্মভিটের টানে নয়। টান তার অন্য জায়গায়। নিখিলের জন্মের পরপরই ওদের বাবা নিরুদ্দেশ। ঠিক নিরুদ্দেশ, নাকি দেশান্তরী, তারও কিনারা হয় না। বিপিনের এক জ্যাঠাতো ভাই কোত্থেকে খবর এনে জানায়, ইপিআর-এর হাতে ধরা পড়ার পর সে পাকিস্তানে জেলের ভাত খাচ্ছে। এপার-ওপার ব্ল্যাকের কারবার তার, ওই রকম সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিতেও পারে না। তাই বলে সে কত বছরের জেল, কোন জেলখানায় তার অবস্থান, দীর্ঘদিনেও সেসবের ঠাঁই-ঠিকানা কিছুই জানা যাবে না! বছর দুয়েকের মাথায় খবর আসে, বিপিন আর নেই। ইপিআর-এর গুলিতে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে নোম্যানস ল্যান্ডে। শেয়াল কুকুরে খুবলে খেয়েছে শরীর। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর খবর তো কত রকমই আসে, মুখ বুজে সবই হজম করে সুরবালা।

কিন্তু এই চমকানো খবর শোনার পর দুহাতে কপাল চাপড়ে বিলাপ করে, তবু সে সিঁথির সিঁদুর মুছতে রাজি হয় না। একাত্তরের বর্ডারখোলা দিনে একবার তার মনে হয়–তারাপুরে গেলে তার যদি কোনো রকম খোঁজখবর পাওয়া যায়! শ্বশুরবাড়ির গ্রাম বলে কথা, কেউ কিছু জানতে তো পারে! নাগালের মধ্যে তারাপুরের মানুষজন পেলে নানান কথা শুধায় আর মনে মনে প্রস্তুতি নেয়, মুসলমানপ্রধান গ্রামে গিয়ে কোনো বাড়িতে প্রথমে উঠবে সেই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। হ্যাঁ, অখিলকে রেখে নিখিলকে কোলে নিয়েই তারাপুর থেকে একপাক ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত যখন ছুড়ান্তপ্রায়, তখনই দিলীপের বন্ধু বাদল হাঁপাতে হাঁপাতে গোবরডাঙ্গায় এসে আছড়ে পড়ে সুরবালার উঠোনে। ঢকঢক করে আকণ্ঠ জল খাবার পর সে জানায় চুয়াডাঙ্গা থেকে আর্মি বেরিয়ে পড়েছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে পশ্চিমে এগিয়ে আসছে। পশ্চিম প্রান্তের গ্রাম জয়নগর, তারাপুর, রঘুনাথপুর পৌঁছুতে আর কতক্ষণ! পাকিস্তান-আর্মির অত্যাচার নির্যাতন সম্পর্কে বাদল এরই মাঝে যে-সব খবর জেনেছে, তার সবটা বলা শেষ না হতেই সে ঘোষণা দেয়–আমি মুক্তিযুদ্ধে যাব দিদি। তার আগে দুটো দিন তোমার এখানে থাকতে চাই।

সুরবালার তারাপুরে যাবার পরিকল্পনা উঠল মাথায়, সহসা সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাদলের সেবাযত্ন নিয়ে। ছোটভাই দিলীপ নেই তার বদলে এই বাদলকে কাছে পেয়ে সুরবালার বুকের ভেতর উথাল-পাথাল করে ওঠে। প্রবল আবেগে তাকে আঁকড়ে ধরে। দিলীপের কথা, এমনকি বিপিনের কথাও খুঁটে খুঁটে জানতে চায়। বছর দুয়েকের ছোট হলেও দিলীপের সঙ্গে নিবিড় সখ্য ছিল, তার বিষয়ে ছোটোখাটো অনেক কথাই ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে পারে, কিন্তু দিলীপের জামাইবাবু বিপিনের কী এমন খবরই বা জানে বাদল! হ্যাঁ, উল্টোপাল্টা অনেক রকম কথা তার কানেও এসেছে বটে, তাই বলে সে সব কথা কি এই মহিলার সামনে বলা চলে! বাদল অপলকে তাকিয়ে থাকে সুরবালার সিঁথির সিঁদুরের দিকে। মুসলমান পরিবারের সদস্য হয়েও সিঁদুররাঙা সিঁথি দেখতে খুব ভালো লাগে বাদলের। তার মনে হয় সামান্য এই রেখাটি বুঝিবা আলো ছড়ায়, পথ দেখায়। বাদলের এই নির্নিমেষ দৃষ্টির সামনে খুব অস্বস্তি হয় সুরবালার, আবার খুব নিভৃতে আনন্দও হয়। বিস্রস্ত আঁচল গোছাতে গোছাতে সে বলে,

কী দেখিস ভাই আনমনা হয়ে?

সোজাসুজি উত্তর দেয় বাদল,

তোমাকে।

সুরবালার ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি, গালে লজ্জার আভা। কুণ্ঠাহীনভাবে বাদল বলে,

তোমাদের এই সিঁদুর রাঙানো ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগে, দিদি।

সুরবালা হাসতে হাসতে কটাক্ষ করে,

এপারে তো সিঁদুরের ছড়াছড়ি, কোথাও যেন আটকা পড়িসনে ভাই।

তামাশার ছলে বলা এমন কথার হয়তো কোনো মানেই হয় না, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বাদল যথার্থই আটকা পড়েছে। তারাপুরের মানুষ আটকা পড়েছে গোবরডাঙ্গায়। বিহারের চাকুলিয়া থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন সীমান্তে যুদ্ধের মধ্যে একটু অবকাশ পেলেই চলে আসে গোবরডাঙ্গায়, আখল-নিখিলের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা জমিয়ে ফিরে যায় গেরিলা শিবিরে। অখিল-নিখিলের স্নেহময় মামা রণাঙ্গনে এসেই হয়ে যায় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। দুঃসাহসী আক্রমণ রচনায় তার জুড়ি মেলা ভার। শৈশবে মাতৃহারা হয়েছে বলে তার মনোজগতে এমনি গোলমেলে আলোছায়া কাজ করে যে সহযোদ্ধাদের মতো অতি সহজে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের সঙ্গে দেশের উপমিত হবার ব্যাপারটা অনুমোদন করতে পারে না; বরং কেমন অবলীলায় সে ঘোষণা করতে পারে, আমার কাছে দেশ হচ্ছে সুরোদির মতো দুহাতে শাখা কপালে সিঁদুর। সুরোবালা শরমে ম্রিয়মাণ হয়ে বলে–পাগল কোথাকার!

পাগলামির শেষ অঙ্ক যে রাতে মঞ্চস্থ হয়, সেরাতে ওদের যুদ্ধটা ছিল পাটকেলপাতার ব্রিজ ওড়ানোর যুদ্ধ। ব্রিজের দুই পারেই রাজাকারের ক্যাম্প, বেলুচ আর্মিও আছে দুজন করে। একেবারে পাক্কা খবর। ওই ব্রিজটা ওড়াতে পারলেই আর্মিদের মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা যোগাযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কাজটা খুবই জরুরি। এ ধরনের জরুরি কাজে বাদল থাকে সবার আগে। সেদিন দুঃসাহসী সেই অপারেশনে ঠিকই সফল হয়, শেষ মুহূর্তে এক রাজাকারের বেপরোয়া গুলিতে বাদল ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। পশ্চিম প্রান্তের অনেক গ্রামই তখন মুক্তাঞ্চল। সহযোদ্ধারা ধরাধরি করে বাদলকে সেদিকেই নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে বাদল নিজেই। চোখ বুজবার আগে সে উচ্চারণ করে–সুরোদিদি, গোবরডাঙ্গা।

সেদিন অতি প্রত্যুষে হিন্দুপ্রধান গোবরডাঙ্গা গ্রামের সুরোবালা দাসীর বাড়ির উঠোনে কবর খুঁড়ে বজলুর রহমান বাদলকে কোনোমতে সমাহিত করা হয়। বাক্যহারা সুরবালা দীর্ঘদিন সেই কবর আগলে বসে থাকে। কেউ কিছু বলতে এলে সে ফিসফিসিয়ে বলে, বিরক্ত করো না। আমার ভাই ঘুমিয়ে আছে। ঘুমোতে দাও। কবে একদিন বাদল নাকি রাতের আঁধারে এসে পেট পুরে ভাত খাবার পর জানিয়েছিল পরেরবার এসে প্রাণভরে একরাত ঘুমোবে। সে সুযোগ তার হয়নি। সুরবালা তাই কিছুতেই বাদলের ঘুম ভাঙাতে চায় না।

একাত্তরে আর নয়, পরের বছরে মহান বিজয় দিবসে স্বাধীন বাংলাদেশের তারাপুর গ্রাম থেকে বেশ কজন ঝাঁকড়া চুলের যুবক কাঁচা আবেগে পা পিছলে চলে আসে এই গোবরডাঙ্গায়, শহিদ বজলুর রহমান বাদলের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে, গলার রগ কাঁপিয়ে ঘোষণা করে–বীর শহিদের কবর আমরা বাংলাদেশে নিয়ে যাব; আমাদের সরকার নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থা করবে। মধ্যবয়সী হিন্দু রমণী সুরবালা দাসী চুপচাপ বক্তৃতা শোনে। কবর কীভাবে এক দেশান্তরে তুলে নেওয়া যায়, কবর নাকি কবরের মানুষকেই টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এসব মোটেই জানা নেই তার। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে একবার সে আর্তনাদ করে ওঠে, আমার ভাই যে ঘুমিয়ে আছে! তোমরা ওর ঘুম ভাঙাবা?

বাহাত্তরের ডিসেম্বরে, সেই একবারই মাত্র এসেছিল তারা; তারপর এই দীর্ঘদিনে আর কেউ এ পথ মাড়ায়নি। এরই মাঝে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে কত রকম নাটকের পালা হয়ে গেল, অবাধ সীমান্ত পারাপার তো বারিত হলো পরের বছরেই, কাঁটাতারের বেড়া তুলে দুদেশের সৌহার্দ্যকে কণ্টকিত করা হলো; স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির উত্থান-পতনের কত রকম খবর সেই বেড়া টপকে চলে আসে, কিন্তু শহিদ বাদলের কবরের আর কোনো খোঁজ হয় না। অথচ সুরবালা দাসী বুকে পাথর বেঁধে প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। এই প্রতীক্ষা তার দুই রকমের। এতটা দীর্ঘ সময়েও স্বামীর নিরুদ্দেশ-রহস্যের সুনির্দিষ্ট কোনো কিনারা করতে পারেনি। অনেকে বলেছে ১২ বছর পেরিয়ে যাবার পর অপেক্ষা করার আর কোনো মানে হয় না, সিঁথির সিঁদুর সে মুছে ফেলতেই পারে। সিঁদুর পরাটা প্রাত্যহিক অভ্যাস বা আচারে পরিণত হয়েছে। হুট করে সেই আচার থেকে সরে আসা কি অতই সহজ! ভাবতে গেলে বাদলের কথা মনে পড়ে। সিঁদুররাঙা সিঁথি তার খুব পছন্দ। প্রতীক্ষা তার বাদলের কবরের জন্যে। কবর ধসে সেই কবে মাটিসমান হয়ে গেছে। কবরের এক পাশে ঝাঁকড়ামাথা ডুমুরগাছ ছাতা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য পাশে সুরবালার নিজে হাতে লাগানো ডালিমগাছ। ডালিম ধরে, পাকে, ফেটে যায়, বুলবুলিতে ঠুকরে ঠুকরে খায়; তবু সে ডালিম তার নাতিপুতিকে কেন যে খেতে দেয় না সে এক রহস্য বটে। অখিল-নিখিলের পৃথক সংসার হবার পর ভিটেমাটি ভাগাভাগি করে নিয়েছে অনেক আগেই।

ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ লেগে আছে কবরের জমিটুকু নিয়ে। সুরবালার জোর দাবি–সামান্য এই জমিটুকু সে ভাগ হতে দেবে না। কাউকে ভোগ করতেও দেবে না। যেমন আছে, তেমনই থাক।

কিন্তু কদ্দিন থাকবে এমন পতিত হয়ে?

এ প্রশ্ন তো মাঝেমধ্যেই ওঠে ঘুরেফিরে। জমিজাগার যেরকম দাম উঠেছে, এখন এক ইঞ্চি মাটিও কি এ রকম অবহেলায় ফেলে রাখার উপায় আছে! ফালতু এক সেন্টিমেন্ট আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে সুরবালা বাড়ির উঠোনের মূল্যবান জমি আগলে বসে আছে বলেই তার দুই ছেলের ধারণা। কবরের এই জমিটুকু নিয়ে দুজনের বাকবিতণ্ডা শুরু হলে তাদের মুখে তখন কথার খই ফোটে, আগুনের গোলা বেরোয়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রশ্ন করে মাকে–তুমি কার জন্য অপেক্ষা করো মা, সত্যি করে বলো দেখি!

সুরবালার গলায় কথা সরে না। চোখের কোটর থেকে মণি ছিটকে বেরোতে চায়। ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে শেষে বলে, আমি আমার কপালের জন্যি অপেক্ষা করি, বাবা।

উত্তরটা বেশ দুর্বোধ্য মনে হয়। অখিল একটু পিছিয়ে এলেও নিখিল নাছোড়। সে বলে,

বাদলমামা তোমার কে?

সুরবালা নিরুত্তর।

মুসলমানের কবর আমরা পাহারা দেবো কেন?

পাহারা তো আমি দেই। তোরা চাস সেই কবরের মাটি চষতে।

এগিয়ে আসে অখিল,

মাটির যে দাম এখন, আমরা মাটি ফেলে রাখব কেন?

পৈতৃক সম্পত্তি তো সব নিয়েছিস বাবা, শুধু এই জমিটুকু না হয় আমার জন্যিই...

ওই কবর দিয়ি তুমি কী করবা, মা?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু সময় লাগে সুরবালার। সে বুঝতে পারে অখিল কেন কবরের গায়ে গরুর গোয়াল করে, নিখিল কেন গোবর ফেলার সারগর্ত তৈরি করে কবরগুহায়। বেশ বুঝতে পারে সে–বাপ-মায়ের আশকারা পায় বলেই তার নাতিপুতিরা নুনু বের করে কবরের মধ্যে পেচ্ছাপ করে, ডুমুরতলায় পেট ঝেড়ে পায়খানা পর্যন্ত করতে পারে। সে যতো ধমকায়, ওরা ততোই দাঁত কেলিয়ে হাসে। ওদের মায়েরা পর্যন্ত ওদেরই পক্ষ নেয়, তারাও নির্লজ্জের মতো হাসে। এ সব তামাশার অর্থ সহসা পরিষ্কার হয়ে আসে সুরবালার কাছে। দুই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে,

তোদের আমি পেটে ধরেছি, মানুষ করেছি, আমার একটা কথা তোদের রাখতে হবে।

মায়ের কথা দুই ভাই কানে তোলে কিনা বোঝা যায় না। অখিলের অমীমাংসিত প্রশ্নই নিখিল আবার জোর দিয়ে তোলে–ওই কবর দিয়ি তুমি কী করবা তাই বোলো?

রফিকুর রশীদ
কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষক

দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সুরবালা ঘোষণা করে,

ওই কবরে আমি শোব।

স্তম্ভিত দুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ওদের গর্ভধারিণী জানিয়ে দেয়–মৃত্যুর পরে আমাকে শ্মশানে নেওয়ার দরকার নেই। তোরা দুই ভাই ধরাধরি করে ওই কবরে নামিয়ে দিস।

অনন্তবালা বৈষ্ণবী, ছবি-সূত্র দেবপ্রসাদ ঘোষ

অনন্তবালা বৈষ্ণবী

গৌতম অধিকারী

‘একাকিনী ভাসিলেন লাউবর্ণ জ্যোৎস্নার হাওড়ে
বৈষ্ণবী অনন্তবালা। থই নাই ভাঙাভগ্ন ডিঙা।
নিতম্ব নড়িলে ভয়–যে অকূল! যদি ডুবে যাই...
‘একবার হেরিব তোরে’, কেঁদে উঠি ‘দাঁড়া রে নিমাই’
(অনন্তবালার সুর : রূপক চক্রবর্তী)

সঙ্গীত

অনন্তবালা বৈষ্ণবী অথবা তাঁর গান সম্পর্কে অনবদ্য অনুভবলগ্ন কবিতাটিতে কবি অনন্তবালার জীবন-সংগ্রামের একটা ছোট্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি রূপক চক্রবর্তী। প্রথম স্তরে অনন্তবালা একক ব্যক্তিক ভাবনায় সত্য। আবার রয়েছে সময়ান্তরিত বাস্তবতার কথা এবং বিষাদলগ্ন বেপথু সেই সময়ের হাহাকার হয়ে ওঠে অনন্তবালার গান–‘দাঁড়া রে নিমাই...’। ব্যক্তিক সীমানা পেরিয়ে একবিংশের নৈরাশ্য-প্রহরও প্রকট হয়ে অন্য চরণগুলির উচ্চারণে,–‘পরক্ষণে কিছু নেই জ্যোৎস্নার কাদায় বাদায় / শুনশান একবিংশ, হাওয়াহীন, লগিও ঠেকে না / এ গহন তলদেশে, মৃতবৎ পাথরের মতো।’ প্রকৃত সত্য যদি অনুসরণ করি, তাহলে বলতেই হবে, ‘জ্যোৎস্নার হাওড়ে’ ভাঙাভগ্ন ডিঙা ভাসিয়ে হরসুন্দরী থেকে অনন্তবালা হয়ে ওঠার ইতিহাসে আসলে লুকিয়ে আছে এক ভাগ্যবিপর্যস্ত গ্রামীণ রমণীর জীবনসত্য

হরসুন্দরীকে আমরা জানলাম ১৯৮৯-তে, একটি ছোট্ট কাগজ ‘পণ’-এ প্রকাশিত অধ্যাপক মণি মণ্ডলের লেখা ‘সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী–অনন্তবালা বৈষ্ণবী’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধধর্মী রচনার মাধ্যমে। সেই সূত্র বলছে, হরসুন্দরীর জন্ম হয়েছিল বাংলা ১৩১০ সালের ১৪ ফাল্গুন। ইংরেজি হিসেবে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ। অবিভক্ত বরিশাল জেলার ছয়ঘরিয়া (মতান্তরে ছয়ঘইরগা) গ্রামে। বর্তমানে যে গ্রামের নাম পূর্ব সাঁচিয়া। বাবার নাম তারিণীচন্দ্র গাইন

শহর কলকাতার সাঙ্গীতিক পরিসরে অনন্তবালার স্মৃতি উঠে এসেছে টুকরো কথায়। ‘বিমানে বিমানে আলোকের গানে’ নামের একটি সাক্ষাৎকারমূলক গ্রন্থে বিমান মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ‘একবার জিতেন ঘোষ [মেগাফোনের মালিক] কোনো এক কাজে বরিশালের দিকে গিয়েছিলেন এবং... সেখানে দেখলেন এক বৈষ্ণবী রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনলেন আর সোজা সঙ্গে করে নিয়ে চলে এলেন।’ তবে এ-প্রসঙ্গে স্বয়ং শিল্পী ১৯৬৯-এর ২৬ জুন রণজিৎ সিংহ, খালেদ চৌধুরীর কাছে নিজে যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলো গুছিয়ে লিখেছেন রণজিৎ সিংহ এভাবে–‘প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে তাঁর সম্পর্কে যা জানতে পারি তা এই–অনন্তবালা বৈষ্ণবীর জন্ম ১৩১১ বঙ্গাব্দে। তাঁর দেশ বরিশাল। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন। সে বছর মেগাফোন কোম্পানি তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড করে। প্রথম গান ‘প্রাণ কান্দে ভাইরে সদায় মাইয়া বলে’। লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে তাঁকে প্রথম যিনি রেকর্ড করবার জন্য মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন তিনি হলেন ছমীর [ছমীরুদ্দিন?]। ছমীর ছিলেন কোম্পানির বড়সায়েব [জে এন ঘোষ]-এর মোটরগাড়ির চালক এবং তিনি ঢাকার লোক। অনন্তবালার সঙ্গীত শিক্ষার গুরু পরেশ দেব।’ (মাটির সুরের খোঁজে / অনন্তবালা / প্রতিক্ষণ, ১৯৮৫) সত্যের অনেকটা কাছাকাছি এই বর্ণনা। কিন্তু এখানেও হরসুন্দরী নেই।

হরসুন্দরীকে আমরা জানলাম ১৯৮৯-তে, একটি ছোট্ট কাগজ ‘পণ’-এ প্রকাশিত অধ্যাপক মণি মণ্ডলের লেখা ‘সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী–অনন্তবালা বৈষ্ণবী’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধধর্মী রচনার মাধ্যমে। সেই সূত্র বলছে, হরসুন্দরীর জন্ম হয়েছিল বাংলা ১৩১০ সালের ১৪ ফাল্গুন। ইংরেজি হিসেবে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ। অবিভক্ত বরিশাল জেলার ছয়ঘরিয়া (মতান্তরে ছয়ঘইরগা) গ্রামে। বর্তমানে যে গ্রামের নাম পূর্ব সাঁচিয়া। বাবার নাম তারিণীচন্দ্র গাইন। গাইন পরিবারের আর একটি বাড়ি ছিল তুরুকখালি গ্রামে, যার এখনকার পরিচয় পূর্ব সাঁচিয়া (বর্তমান পিরোজপুর জেলা)। বিল-বাওড়ের দেশ বরিশাল। তুরুকখালি একেবারেই ছিল বিলাঞ্চল। বর্ষাকালে সেখানে বসবাস কষ্টকর ছিল বলেই হয়তো ছয়ঘইরগা বা ছয়ঘরিয়াতে দ্বিতীয় বাড়িটি তৈরি করতে হয়েছিল গাইন পরিবারকে। পাশ দিয়ে বয়ে-চলেছে ছোট্ট নদী বেলুয়া। এই দুই গ্রামেই কেটেছে হরসুন্দরী অনন্তবালার শৈশব-কৈশোর-যৌবন। দেশভাগের আগ পর্যন্ত। যদিও কৃষ্ণনগরে নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রণজিৎ সিংহ জানাচ্ছেন অনন্তবালার জন্ম ১৩১১ বঙ্গাব্দে। আর তিনি কলকাতা আসেন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। এবং সেই বৎসর অনন্তবালার প্রথম রেকর্ড বের হয়। বাংলা ১৩৩৮ সাল অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩১। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকায় মেগাফোনের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, যার হেডিং ছিল ‘ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত রেকর্ডের বিজয়মাল্য’। এই বিজ্ঞাপনে অন্যান্যদের সঙ্গে অনন্তবালার রেকর্ডের যে গানটির বিজ্ঞাপন ছিল, যে রেকর্ডটির নম্বর ঔঘএ ৪৮৩। আমাদের তথ্য বলছে রেকর্ডটিতে দুটো গান ছিল–‘আমার প্রাণ কান্দে ভাইরে সদাই মাইয়া বলে’ এবং ‘প্রাণসখীরে আমার’। বিজ্ঞাপন ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হলেও রেকর্ডটি বাজারে আসে ১৯৩৮ সালে। স্বাভাবিকভাবেই অনন্তবালার বাংলা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩১-এ তাঁর কলকাতায় আসা এবং ঐ বছরে প্রথম রেকর্ড হয়েছে, এমন কথা মানা যাচ্ছে না। তাহলে কি ধরে নিতে পারি, রণজিৎ সিংহের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলা ও ইংরেজি সালের মধ্যে কোনো সমাপতন ঘটে গেছে। সেই সম্ভাবনাই বেশি। আর বৈষ্ণবীর জন্মতারিখ সম্পর্কে আমাদের অধিকতর নির্ভরতা মণি মণ্ডলের দেওয়া তথ্যে। অর্থাৎ, ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৪ ফাল্গুন অনন্তবালার জন্ম।

নদীকেন্দ্রিক বঙ্গজীবনে শৈশব-কৈশোরের এই কাহিনি প্রকৃতির আনন্দনিকেতনে বেড়ে উঠছিলেন অনন্তবালা। গানকে পেয়েছিলেন পারিবারিক উত্তরাধিকারে। হরসুন্দরী বা অনন্তবালার পারিবারিক উপাধি ‘গাইন’। আর ভাটি-বাংলাদেশের প্রচলিত প্রবাদ হলো ‘বাজাতে বাজাতে বাইন, / গাইতে গাইতে গাইন।’ অনুমান করতে পারা যায় ‘গাইন’ পদবি এই পরিবারের অর্জন করা। অর্জনের ইতিহাস অজানা হলেও পরিবারটি যে সর্বার্থেই পদবিটির যোগ্য, এতে সন্দেহ নেই। হরসুন্দরীর ঠাকুরদাদা গাইতে পারতেন। হরসুন্দরীর বাবাও পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি, কীর্তন, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি গান সুন্দর গাইতেন। দু-চার গ্রামের মধ্যে কীর্তন, হরিরলুঠ, মহোৎসব হলে ডাক পড়ত তারিণী গাইনের। সঙ্গে তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতেন। তারিণীবাবুর তিন ছেলে–যোগেশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র এবং গণেশচন্দ্রের মধ্যে উমেশ ও গণেশ সুগায়ক। এঁদের নিজেদের কীর্তনের দল ছিল। রামায়ণ গানের দলও এঁরা করেছেন। ফলে খুব অল্প বয়সেই হরসুন্দরী বাবার সঙ্গে কীর্তন-মহোৎসবে যেতেন। গান গাইতেন গুপিযন্ত্র বাজিয়ে। এমনকি বরিশালের নিজস্ব লোকগানের পালা ‘রয়ানী’ (রোদনী > রয়ানী), যা আসলে ‘মনসামঙ্গলে’র রচয়িতা বিজয় গুপ্তের কাহিনির গীতিপালা, সেই দলেও গান গেয়েছেন হরসুন্দরী। মাত্র সাত বছর বয়সে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে সেকালের নিয়মানুযায়ী কিছু টাকা পণের বিনিময়ে বিয়ে হয়ে গেল হরসুন্দরীর। পাত্রীর গায়ের রং কালো পণ জুটল না বেশি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিধবা হয়ে দুর্ভোগের জীবনকে জুটিয়ে নিলেন হরসুন্দরী। বিবাহিত জীবনের পরিসর এতটাই কম যে, অনন্তবালা স্বামীর কথা ভালো করে মনেও করতে পারেননি। জীবনের দুর্ভোগ তখন তাঁকে বুঝি বা টানছিল অন্য কোনো জীবনের পথে। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে এলেন হরসুন্দরীর অতীত, হয়ে উঠলেন অনন্তবালা, অনন্তবালা বৈষ্ণবী।

কলকাতার উপকণ্ঠে প্রথম এসে উঠলেন গঙ্গার ওপাড়ে হাওড়ার শালকিয়াতে ৭৪, হালদার পুকুর লেন-এ হরিদাস বৈরাগীর আখড়ায়। বেঁচে থাকার উপায় একমাত্র গান গেয়ে মাধুকরী বা ভিক্ষাবৃত্তি। এমনই একদিনে পথের ধারে তাঁর গান শুনতে শুনতে একটি ছেলে আশ্চর্যজনক প্রস্তাব দেয়, ‘বায়না করে দিলে গাইবেন গান?’ খানিকটা স্তম্ভিত অনন্তবালা নিজেকে সামলে নিয়ে রাজি হয়ে যান প্রস্তাবে। তারপর সেই ছেলেটি, যার নাম কোনোদিন ভোলেননি অনন্তবালা, সেই ইসমাইলের হাত ধরে শালিমার কোম্পানি আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান গাইলেন অনন্তবালা। প্রতিযোগিতামূলক আয়োজনে গুরু-শিষ্য পরম্পরার গান। জাহাজের সারেঙ অথচ গানপাগল মঙ্গল ফকিরের বিপরীতে শিষ্যধারায় গাইলেন অনন্তবালা।

শুরু হলো অনন্তবালার পর্ব। ১৯৩৮-এ বের হয় অনন্তবালার প্রথম গান, রেকর্ড নম্বর-J.N.G. 483। গানটি ছিল :

‘আমার প্রাণ কান্দে ভাইরে, সদাই মাইয়া বলে
হ’ল মাইয়াতে উৎপত্তি জগৎ
মাইয়া আমার হৃদিদলে॥
মাইয়ার গুণের কী দেই সীমা
দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলা–
করেন সেই কালা
যেদিন গিরি ধারণ করলেন কৃষ্ণ–
সেদিন শক্তিরূপে সঞ্চারিলে॥’

গানটি তিনি গেয়েছিলেন পরেশ দেবের তত্ত্বাবধানে। প্রসঙ্গত বলা দরকার

প্রথামাফিক অনন্তবালার গানের গুরু কেউ ছিল না। গান শিখেছিলেন প্রাথমিকভাবে বরিশালের জ্ঞান দত্তের কাছে। মেগাফোন কোম্পানিতে সেই জায়গা নিলেন পরেশ দেব। এমনকি স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলামের কথা ও সুরে তাঁর তত্ত্বাবধানেও গানের রেকর্ড করেছেন অনন্তবালা।

আমাদের দেশে কলের গান প্রচারের পথিকৃৎ হিজ মাস্টার ভয়েস বা এইচএমভি। দেশীয় গানের প্রচারে এঁদের ভূমিকা থাকলেও মনে রাখতে হবে বিদেশি মালিকের এই কোম্পানি দেশীয় সম্পদকে ততটুকুই পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, যতটুকু করলে তাদের বাণিজ্য ও মুনাফা সংরক্ষিত থাকে। এদের আয়োজনে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমান্তরাল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ ছিল না। রেখেছিল জীতেন ঘোষ মেগাফোন কোম্পানি। ১৯১০ সালে গড়ে ওঠে মেগাফোনের গুরুত্ব ও অবদান এক্ষেত্রে সর্বাধিক, এমন কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। আনকোরা শিল্পীদের সন্ধান চালিয়ে তাঁরা একের পর এক রেকর্ড বাজারে এনেছেন। অচেনা অনন্তবালাকে সেই মেগাফোনের কাছেই নিয়ে এসেছিলেন। দক্ষ জহুরি জীতেন ঘোষের হাতে কাঁচা সোনা তখন অলঙ্কার হয়ে উঠতে শুরু করে, এবং এটা ছিল স্বাভাবিক। পল্লিগীতির রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে অনন্তবালার অভিষেক যখন হচ্ছে, সেইসময় এইচএমভি-সূত্রে একটি মাত্র পল্লিগীতি রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা পরবর্তীতে বহুখ্যাত আব্বাসউদ্দিন গেয়েছেন–'আমার হাড় কালা হইল রে দুরন্ত পরবাসে।' ঠিক সেই সময়ে মেগাফোনে ভাটিবাংলার ভাটিয়ালি গানের পসরা জমিয়ে বসলেন অনন্তবালা। যদিও এটা সত্য যে তখন তিনি শুধু ভাটিয়ালি গান গেয়েছিলেন, এমন নয়। গেয়েছিলেন পল্লিবাংলার সবধরনের গান। আসলে তখন পূর্ববাংলার পল্লিগীতিগুলোকেই ভাটিয়ালি বলে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা ছিল শহুরে সমাজে। তাই শুধু ভাটিয়ালি নয়, পূর্ববাংলার লোকসংগীতের একটি সামগ্রিক ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অনন্তবালা।

মেগাফোন কোম্পানিতে অনন্তবালা রেকর্ড করেছিলেন অন্তত দেড়শো গান। অনেকেই বলেন সংখ্যাটা দুশোর বেশি। রণজিৎ সিংহের সঙ্গে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী শিল্পীর নিজের দাবি রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা একশো চল্লিশ। বর্তমান নিবন্ধকার এ পর্যন্ত যেগুলোর সন্ধান পেয়েছেন, তার সংখ্যা একশো উনিশটি, এর মধ্যে একশো আঠারোটি গান অর্থাৎ উনষাটটি রেকর্ডের JNG নম্বর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে চৌদ্দটি রেকর্ডে রয়েছে আঠাশটি গান, যেগুলো পল্লিগীতি হিসেবে প্রকাশিত। এই পল্লিগীতিগুলোর মধ্যে মানব-মানবীর প্রেমানুভবের প্রকাশ রয়েছে 'তুমি বিনে আর মনের দুঃখ', 'আমার বুকের আগুন', 'কোথায় রইলে আমার প্রাণ' প্রভৃতি কয়েকটি গান। কিন্তু অধিকাংশ গানেই বৈষ্ণবীয় প্রেমানুভব মানবিক প্রেমের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। যেমন উল্লেখ করা যায়–'বৃন্দে, বল তোরা আমায়', 'সখি, শ্যামবিচ্ছেদে', 'কৃষ্ণ প্রেমানলে' প্রভৃতি গানের কথা। মনে রাখা দরকার সেকালের অনেক গায়ক-গায়িকা স্বধর্মে বৈষ্ণব না হয়েও গানের রেকর্ডিংয়ে অজানা কারণে 'বৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবী' উপাধি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ধর্মীয়ভাবেই অনন্তবালার জীবন লালিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় উত্তরাধিকারে। বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত তাঁর কাছে ছিল শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো। বিমান মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অনন্তবালা ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণবী। সাজ-পোশাকে বৈষ্ণবীদের দু'রকম পোশাকই পরতেন। ধবধবে সাদা থান ধুতি, নয়তো গেরুয়া রঙের জামা-ধুতি। মাথায় সবসময় ঘোমটা টানা, কপালে তিলকফোঁটা।' (বিমানে বিমানে আলোকের গানে, বিমান মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার)।

শুধু পোশাকে-আশাকে নয়, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বৈষ্ণবের আচার তিনি রক্ষা করছেন, এমন সাক্ষ্যও দুর্লভ নয়। রণজিৎ সিংহ তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার কথায় লিখেছেন,–'আমাদের দেখে তিনি বাইরে এলেন। মনে হলো তাঁর বয়েস ৭০-এর কাছাকাছি। রোগা ছিপছিপে গড়ন। গলায় তুলসির মালা।... অনন্তবালাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা আর কৃতার্থতার বোধে অভিভূত হয়ে আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। পরক্ষণেই বুঝলাম ভুল করেছি। বৈষ্ণবরা কাউকে পা ছুঁতে দেন না। অনন্তবালাও সঙ্গে সঙ্গে আমার পা ছুঁতে চাইলেন। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।' এই জীবনদর্শন তাঁর চিরসঙ্গী বলেই পল্লিগীতি গাইতে গিয়ে 'ওরে নিমাই, কোন দোষেতে গেলিরে ছেড়ে'-র মতো গানে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন চিরায়ত মাতৃহৃদয়ের হাহাকার।

ভাটিবাংলার ভাটিয়ালি গান পারিবারিক ও স্থানিক উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন অনন্তবালা। আমরা তাঁর গাওয়া দশটি ভাটিয়ালি গানের তথ্য পেয়েছি। 'একদিন দেখেছি যারে' কিংবা 'মনের পিপাসায় যত কাঁদব' স্বাভাবিক ভাটিয়ালি হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু ভাটিয়ালি সুরে তাঁর যে দুটো গান একদা গোটা বাংলাদেশকে আলোড়িত করেছিল, তার একটি 'নিমাই দাঁড়ারে, দেখিব তোমারে রে' অপরটি 'যশোদে, মা তোর কৃষ্ণধনরে দে মা গোষ্ঠে নিয়ে যাই।' ভাটিয়ালি সুরে এখানেও বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ। আর ভাষার উচ্চারণে ভাটিবাংলার মাটির গন্ধ লেগে আছে। পূর্ব-গোষ্ঠের সখ্যরসের গানটি কোনো শ্রোতা নিবিড়ভাবে গানটি শুনলে অনন্তবালার আঞ্চলিক উচ্চারণগুলোর বিশিষ্টতা লক্ষ করতে পারবেন। অনন্তবালা গাইছেন 'সব রাখালে গিছে চলে'–এখানে 'গিছে' উচ্চারণটি কিংবা 'হায় মণিগণের দ্বারে দ্বারে'-তে 'মুণি' নয় 'মণি' উচ্চারণ ভাটিবাংলার নিজস্ব উচ্চারণ–বৈশিষ্ট্যে মাটিলগ্ন। কিংবা পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণরীতি মেনে 'কে' নয় 'রে' বিভক্তির ব্যবহার–'সে ফল আমরা না খাই কানাইরে খাওয়াই'। তার বিভিন্ন গানেই এই প্রবণতা ছড়িয়ে রয়েছে। 'গ্রাম্যগীতি' কিংবা 'গ্রাম্যসঙ্গীত' উল্লেখ করে সবচেয়ে বেশি গান অনন্তবালা গেয়েছেন। গ্রামীণ জীবনে মানব-মানবীর প্রেম-বিরহ-মিলন, আনন্দ-বেদনা এসবের উপজীব্য। এমনকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুষঙ্গে রচিত গানেও তো মানবিক প্রণয়ের বেদনা বাঙালি উপেক্ষা করতে পারেনি কখনো। অনন্তবালা গেয়েছেন 'কালা আমায় পাগল কইরাছে রে ঘরে রই কেমনে?' আবার এই গ্রামগীতির মধ্যে একধরনের দার্শনিক উপলব্ধির গানও গাওয়ানো হয়েছে তাঁকে দিয়ে এবং সসম্মানে তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। এমন একটি গান :

ঘরে বাইরে সুহৃদ না থাকিলে রে ও তার মনের দুঃখ হয় না নিবারণ।
ও তার না জোটে পিরিত, ঘটে সকল বিপরীত,
মাঝে চলে বিচ্ছেদ দুঃশাসন॥

কিন্তু বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে অনন্তবালার গাওয়া ইসলামি গানের রেকর্ড-প্রসঙ্গ। বাংলাভাষায় ইসলামি গানের প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের মনের মধ্যে দুজন মানুষের নাম প্রায় অনিবার্যভাবে ভেসে ওঠে–আব্বাসউদ্দিন ও নজরুল ইসলাম। ইসলামি গানের এই জগতে তৃতীয় স্মরণীয় নামটি অবশ্যই অনন্তবালা বৈষ্ণবী। মহিলা শিল্পী হিসেবে তিনিই প্রথম ইসলামি গানের রেকর্ড করেন ১৯৩৮-এই, প্রথম গানটির শুরু ছিল এরকম–'হল রে দোজাহান উজালা।' এরপর একে একে গেয়েছেন 'মুর্শিদ প্রেমের পাকা রঙে', 'আহারে খোদার বান্দা' প্রভৃতি প্রায় চব্বিশটি গান। মুসলিম সমাজ যখন গান শুনলেই কানে তুলো লাগানোর মতো

বিমান মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অনন্তবালা ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণবী। সাজ-পোশাকে বৈষ্ণবীদের দু'রকম পোশাকই পরতেন। ধবধবে সাদা থান ধুতি, নয়তো গেরুয়া রঙের জামা-ধুতি। মাথায় সবসময় ঘোমটা টানা, কপালে তিলকফোঁটা।' (বিমানে বিমানে আলোকের গানে, বিমান মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার)

আচরণ করছে, তখন একজন হিন্দু-বৈষ্ণবীর স্বনামে (অনেক হিন্দু শিল্পী মুসলমান নামে ইসলামি গান গাইতেন) গাওয়া ইসলামি গান ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে, এটা বিস্ময়কর বটেই। এসব গানের মধ্যে জনপ্রিয়তায় সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল 'ধনি প্রেম করতে পারবি কি তোরা' (JNG 5053)। জানা যায় দুদিনে পাঁচশো রেকর্ড বিক্রি হয়ে যায়। গানের কথাগুলো ছিল এরকম :

'ধনি, প্রেম করতে কি পারবি তোরা
আমার নূরনবী জগতের পতি, প্রেমেতে সে হল্ করা।
প্রেমের তত্ত্ব জেনে নবী ধরে আনে চৌদ্দ বিবি
টের পায় না মুনশী মৌলবী জনরা॥

গানটি নিয়ে বিতর্ক হয়। গানটিতে 'চৌদ্দ বিবি' শব্দের ব্যবহার ঠিক নয়। ওখানে 'এগারো বিবি' শব্দবন্ধ চলতে পারে–এরকম একটা দাবি উত্থাপন করলেন কুষ্টিয়ার একজন মাওলানা। সেই অনুযায়ী নতুন রেকর্ড তৈরির কথা ভাবা হলেও কুষ্টিয়া আদালতে মাওলানা সাহেব অভিযোগ করেন। অভিযোগ ছিল দুটো 'চৌদ্দ বিবি' যথার্থ প্রয়োগ নয় এবং এটা ইসলাম-বিরোধী। দাবি ছিল হিন্দুর মেয়ে ইসলামি গান গাইতে পারবে না। এক বছর মামলা চলে, কোম্পানি হেরে যায়, পুলিশ রেকর্ডগুলো ভেঙে দিয়ে যায়। মানসিকভাবে জীতেন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার যেমন তেমনই অনন্তবালাও ভেঙে পড়েন। শোনা যায় অনন্তবালা পনেরো দিন বিছানা থেকে ওঠেননি। এই কারণে আর দুজন মানুষ আঘাত পেয়েছিলেন, তাঁদের একজন মঙ্গল ফকির, গানের রচয়িতা ও অনন্তবালার পিতৃপ্রতিম। আর একজন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। একাধিকবার অনন্তবালার কাছে তিনি ক্ষোভ ও অনুতাপের কথা জানিয়েছেন। তবে এই ঘটনার পেছনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আড়ালে লুকিয়ে ছিল একজন কবি ও মেগাফোনের মালিকের অহংবোধের লড়াই।

অনন্তবালা গানের শিল্পী ছিলেন, গানের কথা বা বাণীর লেখিকা ছিলেন না, এমনটাই প্রচলিত ধারণা। তিনি গান গেয়েছেন মঙ্গল ফকির, ভবানী দাস, ঈশান দাস, প্রমুখের কথা বা বাণীতে। এসব গানের একটা বড়ো অংশ সুর করেছেন ও তাঁকে শিখিয়েছেন পরেশ দেব। গেয়েছেন ভবানী দাসের সুরেও। স্বয়ং নজরুল ইসলামের কথা, সুর ও তাঁর তত্ত্বাবধানে অনন্তবালা অন্তত দুটি গান গেয়েছিলেন জানা গেছে। এগুলোর একটি হলো :

'খোদার রহম চাহ যদি নবীজীরে ধর।
নবীজীরে মুর্শিদ কর নবীর কলমা পড়।'

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে গানটির প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তবে কিছু গান যে তিনি নিজেও লিখেছিলেন, এমন তথ্যের একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে রণজিৎ সিংহের একটি রচনায়। ১৯৬৯-এর ২৬ জুন খালেদ চৌধুরী, অধ্যাপক সৌম্য চক্রবর্তী আর রণজিৎ সিংহ কৃষ্ণনগরে দেখা করেছিলেন অনন্তবালার সঙ্গে। সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে রণজিৎ সিংহ লিখেছেন, 'অনন্তবালা গানও রচনা করেছেন। তাঁর রেকর্ডের কিছু কিছু গানে 'অনন্ত তাই ভেবে বলে' বা 'অনন্ত ভেবে বলে' ভণিতা শোনা যায়।' (মাটির সুরের খোঁজে, অনন্তবালা, প্রতিক্ষণ)।

সাধারণ লেখাপড়ার সামান্য সুযোগ তিনি গ্রামের বাড়িতে পেলেও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আব্বাসউদ্দিন বা শচীন দেববর্মণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ অনন্তবালা পাননি। তাছাড়া ওঁদের মতো আর্থিক সঙ্গতির সুযোগ ছিল না অনন্তবালার জীবনে। শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর আর্থিক দৈন্য কেটেছিল, এটা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু বেহিসাবি খরচ, দান-ধ্যানে সে অর্থ সঞ্চয় করবার মানসিকতা তাঁর কতটা ছিল, এ প্রসঙ্গে সংশয় জাগে। শিল্পীর অমিতব্যয়ী স্বভাবদোষ অথবা বঞ্চনা, যে-কারণেই থাকুক না কেন, আর্থিক দৈন্য যে তার সারা জীবনের সঙ্গী ছিল এই সত্যিটা মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা থাকে না। একটা সময়ের দুঃসহ দারিদ্র্যের কথা আমরা জেনেছি রণজিৎ সিংহের লেখাতেই। রণজিৎ লিখেছেন–কোম্পানি প্রথমে তাঁকে রেকর্ডিংয়ের জন্য গানপ্রতি ২৫ টাকা করে দিত। পরে কোম্পানি তাঁকে ১৫০ টাকা মাসমাইনের শর্তে স্টাফ আর্টিস্ট করে নেয়। এছাড়া যাতায়াতের খরচাও তাঁকে দেওয়া হতো।

এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলা লোকসংগীতের জগতে অনন্তবালা ছিলেন আপন মহিমায় উজ্জ্বল। কমলা ঝরিয়ার মতো শিল্পী 'অনন্তদি'-র কথায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সাক্ষাৎকারে আঙুরবালা বলেছিলেন, অনন্তবালা বৈষ্ণবীর ভাটিয়ালি-পল্লিগীতি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত। রূপদর্শী গৌরকিশোর ঘোষ ছিলেন অনন্তবালার গুণমুগ্ধ শ্রোতা, যিনি বিমান মুখোপাধ্যায়কে অনন্তবালার গান বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন, একথা জানিয়েছেন স্বয়ং বিমানবাবু। সেই অনন্তবালা ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন মূলত দেশভাগ-জনিত কারণেই। দেশভাগের আগে বরিশালের সঙ্গে যে সম্পর্কটুকু ছিল তা একবারে চুকেবুকে গেল। অনন্তবালা প্রথমে ঠাঁই নিলেন নদীয়ার বেতাই নামক স্থানে একটি উদ্বাস্তু কলোনিতে। তারপর কৃষ্ণনগর রোড স্টেশনের কাছে গড়ে তুললেন ছোট্ট আবাস, তৈরি করেছিলেন তাঁর আরাধ্য রাধামাধবের মন্দির। পূর্ববাংলার বিপুল শ্রোতার কাছে তাঁর গান পৌঁছানোর পথ বন্ধ। ফলে রেকর্ডের গানে ভাটিয়ালিতে তখন ভাটার টান। বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে গানকেই অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন তিনি। (All India Redio)-র একটানা সাত বছরের শিল্পী গিয়েছিলেন গান গাইতে আকাশবাণীতে আর একবার। কিন্তু নতুন করে অডিশন দেবার কথা বলতেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে। ভেতরে হয়তো গুমরে কাঁদছিল অভিমান, কার কাছে দেবেন তিনি ভাটিয়ালির পরীক্ষা?

সাধারণ লেখাপড়ার সামান্য সুযোগ তিনি গ্রামের বাড়িতে পেলেও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আব্বাসউদ্দিন বা শচীন দেববর্মণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ অনন্তবালা পাননি। তাছাড়া ওঁদের মতো আর্থিক সঙ্গতির সুযোগ ছিল না অনন্তবালার জীবনে। শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর আর্থিক দৈন্য কেটেছিল, এটা বিশ্বাস করা যায়

কিন্তু ১৯৬৯-এর সময়কালের বারো-তেরো বছর আগে থেকেই 'কোম্পানি আর কোনো টাকা-পয়সা দেয় না। দশ-বারোখানা রেকর্ডের স্বত্বও আছে তাঁর, রয়্যালিটি পাওয়ার কথা। তাও আর পান না।' এই বাস্তবতাকে ভবিতব্য করে কিছু ভক্ত-অনুরাগীদের সাহায্যে অনন্তবালা বেঁচেছিলেন বাংলা ১৩৮৫-র আষাঢ় মাস পর্যন্ত। ইংরেজি ১৯৮৫ সালে তিনি প্রয়াণ হন। কিন্তু কত তারিখে সেই নির্দিষ্ট দিনের সন্ধানটাও অজানা রয়ে গেছে। সময়ের সংকট শিল্পীকেই শুধু গ্রাস করেনি, গ্রাস করেছে শিল্পকেও। আমাদের মনে পড়ে যায় বিজন ভট্টাচার্যের 'রাণীপালঙ্ক' উপন্যাসের যুগীবর সূত্রধরকে। দেশভাগের আগে যে মানুষটি শিল্পীর অহমিকা নিয়ে রাণীপালঙ্ক তৈরি করত, দেশভাগের পরে সেই যুগীবরের শিল্পীসত্তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তুচ্ছ খাট বা খাটিয়া তৈরিতে। শুধু শিল্পী নয়, দেশভাগ শিল্পকেও করেছে উদ্বাস্তু। অনন্তবালার অনন্ত যাত্রাপথের বিষাদছায়ায় কি উদ্বাস্তু শিল্পটিও আমাদের একবিংশের বন্ধ্যাদশার কাছে পরাজিত হয়নি?

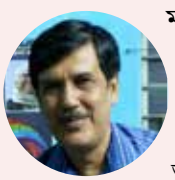

গৌতম অধিকারী
প্রাবন্ধিক ॥ সাহিত্যের শিক্ষক, হিন্দু স্কুল

কালীকৃষ্ণ গুহ
বসন্তের দিনে

চারদিকে পলাশ ফুটেছে
সময়ের অবিরাম ধারা
প্রবাহিত–আমের মুকুল
চারদিকে, স্থির ধ্রুবতারা।

তুমি কোনো দিন কাছে ছিলে
তুমি ছিলে সময়ের তীরে
কত স্পর্শ ছিল–কত দ্বিধা–
আজ সব মনে পড়ে, ধীরে।

জনতার মাঝখানে একা
ব্যাখ্যাতীত ছিল বাক্যরাশি
অপেক্ষাও ছিল অজানায়
মুখে ছিল উন্মাদের হাসি।

দাঁড়াও নিজের মুখোমুখি
আজ এই বসন্তের দিনে
মাঝখানে দূরত্ব অনেক–
এগোবে না পথ চিনে চিনে?

সুধীর দত্ত
কবি

কতকাল হেঁটে গেছি। বাকল ছাড়িয়ে। মেঘ জারুলের বনে।
দাউদাউ আগুন, আগন্তুক।

আমি স্তব্ধ। বুক মচকানো ঢেউ। বাজে বাজনা ভাসানের।
আলপথে নতুন ধান। না-গুলো হারিয়ে রূপ কখনো হ্যাঁ হয়। রূপান্তরণ। এও এক রণনীতি।
বালি আর অক্ষরের কুচি।
মৃত নক্ষত্র যত খসে পড়ে। বিন্দু বিন্দু আলোর ফসিল।
কী অদ্ভুত সদ্যোজাত কান্না আর একটি রক্তনদী তার চাবুকের রেখা
তখনো গভীরে বিস্ফারিত। ধুম লাগিয়ে কোনো এক অতল বিতলে ডেকে
ক্রমশ কবিকে নিয়ে যায়।
কবি কি সত্যিই যায়, নাকি গেছে কোথা থেকে কোথাও কোনো দিন!

লোকে বলে, বিছানায় শুয়ে থেকে হাঁটে আর গভীর নিদ্রার মধ্যে কবি
অশ্বের চেয়ে দ্রুত, পাথরের চেয়েও নিশ্চল।

দুখু বাঙাল
কবিও সাঁতার জানে

মানুষ বুভুক্ষু যদি, আমি গাছ–আমি এক পল্লবিত তরু
নদীজলে দোল খায় জ্যোৎস্নায় কবি এক চণ্ডীদাস, বড়ু।

মানুষ হলে একলাফে মরিপড়ি ঝাঁপ দিয়ে প্লাবিত জলে
চোখ বুঝে দিনমান ভাঙা যেত দুই কূল ঢেউ তুলে তুলে।

ইচ্ছেনদী–স্বৈরিণী, অবশেষে দ্বিধা হয়ে ভাসালে দুকূল
আমি তো চেয়েছি শুধু দোয়াব অঞ্চলজুড়ে শতবর্ণ ফুল।

কবিও সাঁতার জানে, যেই নদী বুকে ধরে কুসুমের ভেলা
কবির স্বভাব এই–বাকি সব ধারাপাত হাভাতেই গেলা।

মানুষ বুভুক্ষু যদি, আমি গাছ–আমি এক পল্লবিত তরু
নদীজলে দোল খায় জ্যোৎস্নায় কবি এক চণ্ডীদাস, বড়ু।

সালিম সাবরিন
ঈশ্বরের জলছবি

শুদ্ধ হওয়ার খেলা খেলতে খেলতে
নিথর শূন্য হাতে
আমি কোনো ঈশ্বরের জলছবি আঁকি না;
মানুষ তো!
সকলেরই প্রতিবিম্বে আছে কিছু মোহনীয়
অপরাধ!
তবু জীবনের হাতে অর্পিতা মৃত্যুর পুষ্পাঞ্জলি
অমোঘ করতলে স্বচ্ছ করে তুলি
প্রতিবিম্বের আয়না;
অক্ষম আক্রোশে নিজেই নিজের আঙুল কামড়ে ধরি;
স্নায়ুর সঙ্গে সন্ধি করি কেবলই
বিদ্রুপার্হ শিল্পের আয়োজনে
নিজেই নিজেকে শোনাই উন্মাদ কাকলি–

যখন অপরাজনীতির ভাঁড়, বেশ্যা, বণিক
নয়াবুদ্ধমূর্তির শুদ্ধ ঈশ্বর হয়ে ওঠে!
উন্মাদ সময়ের পীঠে–
যুদ্ধ হত্যা ও শিশুর রক্তে রচিত সংকলনে
বিমানবিকতায় স্বঘোষিত শিল্পের চাতুর্য
মাধুরীতে

আমি শুদ্ধ হওয়ার খেলা খেলতে খেলতে
নিথর শূন্য হাতে
মরাগাঙপারে বসে কোনো ঈশ্বরের জলছবি আঁকি না...।

সবুজ তাপস
অভাব

পাখি, তারে দেখি,
চাঁদ আঁকি, চারুশাখী

মন-মাঝে ভয়–
উনো পরিচয় শুধু

পাখি, তার দেখি
দূরে উঁকি পাকাপাকি

আর নয় তর,
খালি প্রান্তর ধু-ধু

পাখি, দাও ডাকি',
হৃদে ঝাঁকি, করো সখি
নয়নাভিরাম,
চাই খুব
প্রেম-কামে বুঁদ,
বন্যাময় গ্রাম

দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম
চাঁদ বিষয়ে আরেকটি

চাঁদ বদলে যায়। এই যে ভাবি, চাঁদের আলোয় তোমাকে পাব, তার কি হবে? সমস্ত শহরময় স্তব্ধতা নামে, মেঘদল এসে বিশ্রাম নেয় আমাদের ছাদে, অচঞ্চল ক্লান্তির কাছে নতজানু শীতের পাখিরা জমা দেয় উড়ানের শর্তাবলি। আমাদের না-বলা কথাগুলো ফুলের সৌরভ হয়ে শিশিরে মিশে যেতে থাকলে কারা যেন সুগন্ধির বিজ্ঞাপন টানায় অলি-গলিতে। রাত্রির কাছে বসে থাকি, চাঁদের নিচু বসে থাকি, রাত্রির কিছু এগোলো, চাঁদের কিছু চেনা গেল?

মালা

মিনার মনসুর
ভেতরে শুয়ে আছ তুমি

মাংসের দাম নিয়ে বড়োই উদ্বিগ্ন তুমি।
করুণ চোখে দেখছ কসাইয়ের ছুরির কারুকাজ।
আর দীর্ঘশ্বাসে ভরে যাচ্ছে তোমার বুক।
তোমার হাত ধরে থাকা শিশুটি কাঁদছে।
একটু আগেও গরুটিকে ঘাস খেতে দেখেছে সে।
মায়ের বিপন্ন আঙুল আঁকড়ে ধরে শিশুটি দাঁড়িয়ে
আছে লাশকাটা ঘরের সামনে।
ভেতরে শুয়ে আছ তুমি। একটু আগেও
স্কুলের ইউনিফর্ম পরে বাইকে তোমার
পাশেই বসেছিল সে।

দুলাল সরকার
ধ্রুপদী উদ্যান

শরীরের কোথাও এই গল্পগুলো থেকে যায়
কোথাও লুকিয়ে থেকে অনুচ্চারিত সেই
গল্পগুলো বড় হয়–বড় হতে হতে
একদিন জীবনের অংশ হয়ে জীবন নামক
এক গল্পের প্রচ্ছদ হয়ে নদী, পাখি, জল
ও জলজ ডানায় অন্তর্লীন হয়;
তারপর কিছুদিন মৃত্যুর লোকজ ঘ্রাণের কথা
ভুলে গিয়ে মায়াবী বিহঙ্গ, হাত রাখে ঘুঘুর পালকে–
চেয়ে দ্যাখে বিকাল হতেই
চিরায়ত গল্পের কথা মনে করে কিছু কিছু
প্রজাপতি আর কিছু চর্যার হরিণী
মহাবিশ্ব ভ্রমণ শেষে করোটির ধ্রুপদী
উদ্যানে ফেরে একা, খুব একা হয়ে যায়।

সিদ্ধার্থশঙ্কর ধর
করমণ্ডল এক্সপ্রেস

দুর্ঘটনা শেষে করমণ্ডল থেকে কয়েকটি রেখাজট খুঁজে পেলেন জ্যোতিষী। ধ্যানে, চোখ বুঁজে কিছু দেখেন প্রত্যাশানুরূপ। মুখে প্রচলিত চারণমন্ত্র জপেন। অবশেষে সাধ্যের বাহির সীমানায় স্বস্তিবচন মেলে উজ্জ্বল পাথর বিধানে। তিনি তাঁর লাল চোখে ও অভিজ্ঞতামতে অবশিষ্ট হিসেব করে পকেট উজাড় করে নেয়, লোকবিশ্বাস ও প্রথা-অনুকূলে। মুক্তি মেলে তাঁর, অপেক্ষার, আশঙ্কারও কিছু, দুর্বল চিত্ত মেনে নেয় সবকিছু।

জ্যোতিষী দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হিসেব করে স্নান করেন প্রতিদিন। প্রার্থনা–উপার্জন যেন ভালো হয়! একদিন নবনীতাদি এই প্রকার তীর্থে বেড়াতে এসে আঁচল পেতে বসে পড়েছিলেন, কিছু নাকি পেয়েছিলেনও বটে পয়সা-কড়ি, কিছুদিন সে গল্প করেছিলেন লোকজনের সাথে। এই পথে করমণ্ডল ট্রেন ছুটে যায় রাতে।

দেখা হলো শান্তিনিকেতনের লালমাটি, সাঁওতালপাড়া। কথায় কথায় স্বাতীবৌদির সাথে কল্যাণেশ্বরী যেতে, প্রাসঙ্গিক আলাপচারিতায়। যেতে যেতে বললেন সেদিন, তিনিও ছিলেন সাময়িক দ্বিধা-যাতনায়, দুঃস্বপ্ন দেখেছেন কিছুদিন। ঢাকা ফিরে জানলাম, বেলাল ভাই তখনো রাত জেগে আছেন, কখন ফিরব আমি। স্বাতীবৌদির সাথে কথা তখন বলছেন ফোনে। করমণ্ডলে নাকি দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

নিশ্চয়ই, উজ্জ্বল পাথরে বাঁধা হাত, অনেকেই বেঁচে নেই বার্ধ্যক্যজনিত ত্রুটিতে। করমণ্ডল ছুটে চলে রাতে আরোগ্যনিকেতনের দিকে।

মাহমুদ কামাল
যতই প্রেক্ষণ হোক

মুখের ওপরে বসে আছে আরেকটি মুখ
তাকেই রচনা করে অক্ষরে অক্ষরে
প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন মুখের ছবি
পুরোনোকে প্রচ্ছদের নিচে রেখে দিয়ে
নতুন মুখের কারুকাজ
যতই প্রেক্ষণ হোক, উদ্ভাসিত হোক
পুরোনোই উঁকি দেয় আলোঝরা রাতের নিস্বনে
মুখের ভেতরে মুখ
নাকি মুখোশের ভেতরে মুখোশ
নিরূপিত হতে হতে, দ্রুতবেগে
গ্রাস করে শুয়োপোকা ঘুণপোকা যতো
অতএব খুলি এসো মুখ থেকে
আরোপিত মুখের আদল
পুরোনো মনীষা আর জিগীষাকে এসো সুপ্ত করি।

মাহবুবা ফারুক
আদান-প্রদান

বিয়ারিং ডাকে কিছু কষ্ট পাঠিয়েছ
খাম অবমুক্ত করে জানলাম
না হস্তান্তরযোগ্য, না সংশোধনযোগ্য।

ফেরত ডাকে রেজিস্ট্রি করে
অবশিষ্ট সুখগুলো পাঠালাম
স্বাক্ষর করে রেখে দিয়ো।

কিছু দুঃখ পিছু ছাড়ে না
দেয়ানেয়া সমান হারে হতে হবে
এমন কোনো কথাও নেই।

কিছু আদানপ্রদান এমনিই হয়।

মানিক সাহা
অনেকদিন পর বৃষ্টি হলো

অনেকদিন পর বৃষ্টি হলে গাছেরা খলখল করে ওঠে।
তাদের সারা শরীরজুড়ে আলো জ্বলে–
মোলায়েম, কচি সবুজ আলো। যেন

দরিদ্র ঘরে মাসপয়লা বেতন ঢুকেছে, আর
নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে থাকা পিতার চোখে
ভরে উঠছে সুদৃশ্য পুকুর–
যেন, বহুদিন পর দরিদ্র পিতা সকলের
প্রিয় খাবারগুলো আনতে পেরেছে।

সোহরাব পাশা

হেঁটে যাওয়া ছায়ার ঘ্রাণ

মুখর বসন্ত ওড়ে কোথাও
ছোট ছোট গল্পের রংধনু
বৃষ্টি এলে খুলে যায় দেহের কাহিনি
ডালিম ফুলের স্নিগ্ধ দ্যুতি
সৌন্দর্য ফোটার রোদের কোলাহল,

রঙিন ফুলেরা তীব্র ফোটে
যুবতী জামার নিচে
গভীর গোপন ঘ্রাণে ভিজে যায় কাহ্নপার চোখ
শোনে অজস্র বিনিদ্র রাত্রির কোরাস; তবু তার
ডাক শোনেনি–'এই তো আমি।'

পৃথিবীর কোন্ পথে হেঁটে গেছে তার রাঙা পা'
খুঁজে ফেরে তারে শেষ দশকের কবির হৃদয়,
'হৃদয়কে অবসন্ন করে'
হেঁটে যাওয়া ছায়ার ঘ্রাণ;

ভালোবাসার শেষ বাড়ি নিয়তই
দীর্ঘ দূরত্ব রচনা করে আবছায়া অন্ধকারে–।

জাফর সাদেক

খুনকুমার

যদি বলি, সময়ে ছিলে মগ্ন সাঁকো হবার
সময়কে অসময়ে জাগিয়ে ছিলে ধূপসুখী আঁধার
নিঃসঙ্গ অতীতের কূপচিত্রে তুলে ধরতে
স্তন-নির্ভর গ্রিক দেবীর কাম-পুরাণ
ইচ্ছের কাছে নতুন ভাষার ছন্দটা ধরতে পেরে দেখলে
খেয়ালের নদী শরীরে প্রশ্রয় পেলে
সহজে ধরতে পারে বিলম্বিত পথের অনুবাদ

অতীতে তোমরা ছিলে এমনই খনন অপেক্ষার নন্দন
নদীর উজান স্রোত নিজের করে নিয়ে
পাড়ভাঙা পাড়ে নৃত্যের ওধরে প্রতীক্ষায় রাখতে
নিজস্ব চন্দন বনে জোছনার রাগ

আমরাও দূর থেকে সন্ধে নিয়ে রাত্রি নয় ভোর নয়
কোথাও শিব-তেজি সূর্যের দহনে জ্বলতে চাইতাম
মোহনায় অপেক্ষায় থেকে থেকে বর্ষায় বুঝে যেতাম
যে তৃষ্ণার্ত সে জলেও কিংবা মরুতেও
তবুও ভাবতাম ক্লান্তির রেখায় ডাক পড়বে একদিন
তোমাদের কূপ খনন প্রকল্পে আমরা খুনকুমার

আশিস গোস্বামী

বেহুলা পৃথিবী

অথবা গুনগুন
গুনিয়ে ক্রিসমাস
আজ নয়
পলক পড়ে না
তবে তিনকাল তারা

কহনা কুছ
এ তটে
এমন আরও
পালকটানা প্রিয় মন
কর খুলে চারপালা
ঝিমঝিম

আজ আবার
সেই পথ
ওগো ফুলতোলা
সোহাগের খই
একরাত বেহুলা পৃথিবী

চিত্তরঞ্জন হীরা

একটু বিমূর্ত

নিশ্বাসের তানে যারা
খুঁজে পেতে চায়
একটু বিমূর্ত
তাদের জন্যে
আলোপিঠ গুছিয়ে
অন্ধকার পুষি।
এবং আমাদের ভরপেট
না দেখাও।

কে যেন একরাত
পরিযায়ী হলো!
কে যেন সাঁতার সাঁতার
প্রজাপতি আঁকা দিঘিতে!
শেষ হতেই ছুটছুট
আরও একঘর!

তমালের ছায়া বাটা
এই তো গুটিয়ে
কয়েকটা আনাচের ফের
ফেরি হয়ে ডুবো ডুবো
দেখা হলো কুয়াশার কোলে
ন'বিঘার বসন্ত।

ঘরে ফিরে
ঘরে ফিরে
চিরকুট ফেলে
তবুও তো
বেশ ঘেটে দিলে
এবারের পিয়ানো!

রনি অধিকারী

স্বপ্নভাঙা পদাবলি

কর্কশ পেরেক বুকে ঠুকে যন্ত্রণায় কাতর হৃদয়
অগ্নিদগ্ধ পোড়া ঘ্রাণ জীবনের রং বদলায়।
হৃদয়ের কাছাকাছি নেমে পড়ে বাইরে ফাগুন
জলের সংসার থেকে নিভে যায় বাতাসে আগুন।

মায়াবী করুণা ক্রমাগত বেড়ে ওঠে মিথ্যের মহলে
অনাদর অভিমানে বরফ নদীতে আলো জ্বলে।

নদী ভাঙে নদী থেকে মেঘ ভাঙে দূর নীলিমায়
স্বপ্ন ভাঙে চোখ থেকে অন্য চোখে নষ্ট জোছনায়।

সঞ্জয় দেওয়ান

পুঁজির চিত্রকলা

নান্দনিক ব্যঞ্জনে অতলান্তিক ঢেউ
খেলে যায় নাগরিক রসনায়,
প্রেমে-কামে, ঘ্রাণে-গন্ধে
বিমূর্ত শিহরন জাগে পাললিক মনে।
অদৃশ্য শব্দের রেকাবিতে জমে
দুঃস্বপ্নের বরফগলা জলছাপ!
বদ্ধ কোটরে আততায়ী শিখা
চুমু খায় কচিশ্বাসে,
তালপাতার শরীরে আঁকে প্রাচীন আলপনা।
স্বেদবিন্দুতে গড়া এ জনপদে
মৃত চোখ নির্নিমেষ দেখে পুঁজির চিত্রকলা।

নাজিয়া ছায়া

অলীক

বিষণ্ণতার সুতোয় সুতোয় বোনা
আয়নাঘরের ছায়া ছায়া আলো
ভাবনা ঘেরা পর্দার আড়াল থেকে
কখন যে ঠিক সিঁড়িটা হড়কালো!

মেপে মেপে পা ফেলেও শেষে
হারিয়ে গেল পায়ের নিচের তল
ঝিরিক ঝিরিক শব্দে মাতোয়ারা
যায়নি বোঝা কতখানি জল।

ভাবুক ডুবুক টইটুম্বুর বেলা
স্বপ্নজলের উজাড় করা রাত
ঘুড়ি টেনে নাটাই গোছায় তবু
নির্বিরোধী অশ্রুমোছা হাত।

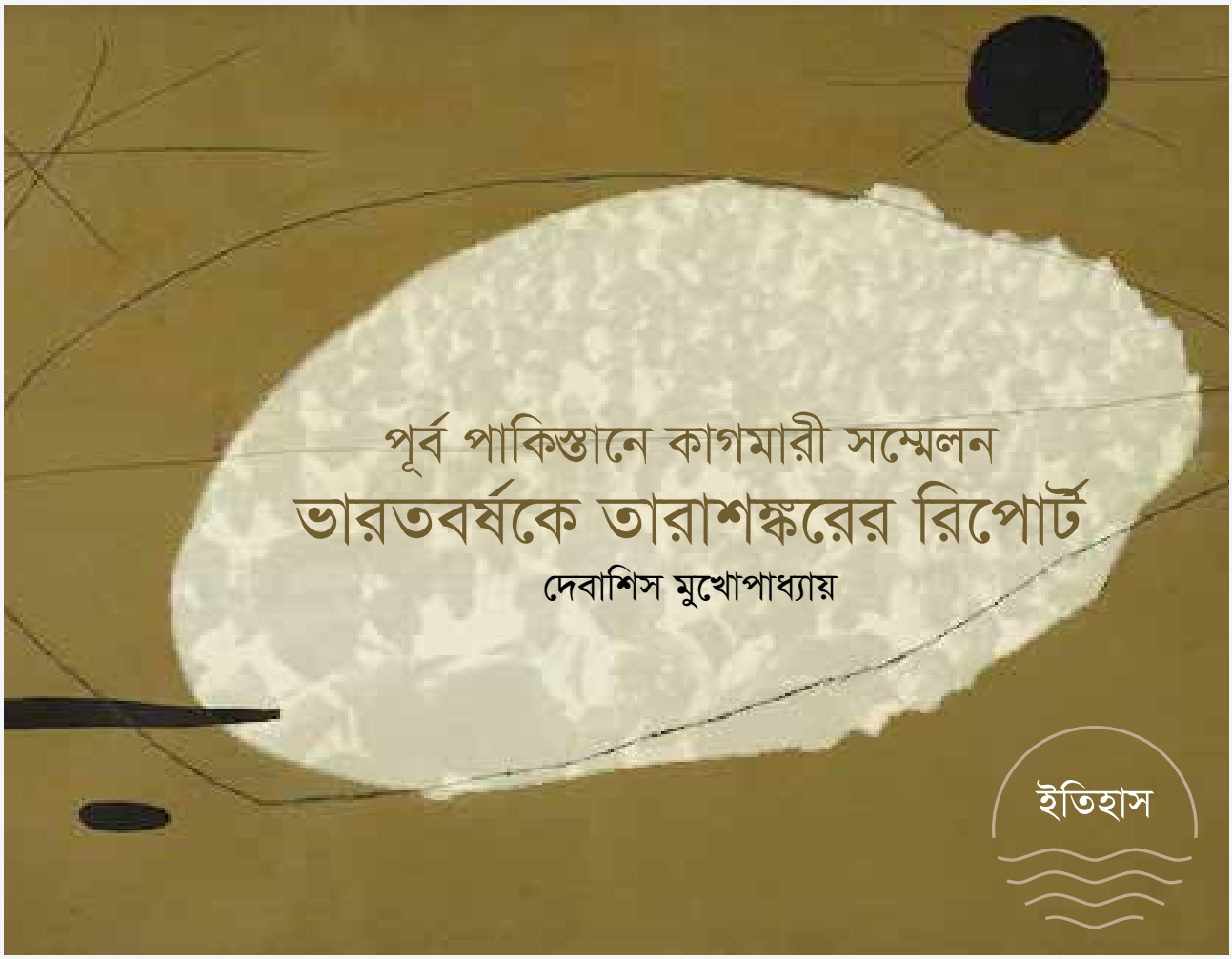

পূর্ব পাকিস্তানে কাগমারী সম্মেলন

ভারতবর্ষকে তারাশঙ্করের রিপোর্ট

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস

পূর্বপাকিস্তানের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক স্মরণীয় অধ্যায়; বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন ভূগোল রচনার ঐতিহাসিক সূচনালগ্ন বলেই মনে করতে হয়। আজকের যে বাংলাদেশ আপন আত্মগরিমায় ভাবে ও ভাষায় নবরূপে বিনির্মিত তার অঙ্কুরের প্রকাশ ঘটে ওই সম্মেলন থেকেই। পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবিতে বিপ্লবী জনমত গড়ে তুলতেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল

পূর্বপাকিস্তানের আওয়ামী লীগের জনদরদি নেতা বিখ্যাত ভাসানী সাহেব সেবারেই বলেছিলেন পশ্চিমপাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হচ্ছে। কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে উপস্থিত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাসানী সাহেব সেবিষয়ে একেবারে নির্ধারিত সময়েরও উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। অখণ্ড বাংলার সন্তান তারাশঙ্কর তখন বাংলাদেশের কাছে একজন বিদেশি সাহিত্যিক। কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তারাশঙ্কর এবং সম্মেলনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ভারতবর্ষকে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেন। বাংলাদেশের সারস্বত সমাজের কাছে সেই রিপোর্টটি তুলে ধরতে আমরা এখানে প্রয়াসীমাত্র।

১.

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৫৭ সালের ০৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টার সময়। অধিবেশন উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, সভাপতিত্ব করেন সম্মেলনের মূল সভাপতি ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। স্বাগত ভাষণ দেন মওলানা ভাসানী সাহেব। সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন হুমায়ুন কবির, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার স্যানাল, নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ। তারাশঙ্কর তখন পশ্চিমবঙ্গ-বিধানপরিষদের রাজ্যপাল মনোনীত সদস্য। বিরাট সভামণ্ডপ। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ। মাইকের সামনে উঠে দাঁড়ালেন তারাশঙ্কর। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসম্মেলনে এবারে তাঁর তৃতীয়বারের উপস্থিতি–পরিচয়ে বিদেশি তথা ভারতীয় কথাসাহিত্যিক। বাংলাদেশ তখন ভাষা আন্দোলনে ইতিহাস রচনা করেছেন। পুরোনো অভিজ্ঞতার স্মৃতি এবং সদ্য রচিত ইতিহাস স্মরণে রেখে স্নেহময় আবেগজড়িত উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করলেন তাঁর ভাষণ–

ভাষার জন্যে যে বাংলার সোনার ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলেছেন, সে বাংলার মাটিকে প্রণাম জানাই। বাংলা দ্বিধাখণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু ভাষা সংস্কৃতি দ্বিখণ্ডিত হয়নি। মানস জগৎকে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না। তাই এই বাংলার ডাকে ছুটে এসেছি ঐ বাংলা থেকে। বুকে জড়িয়ে ধরতে এসেছি আমার হারানো ভাইকে। আজকের এই পুণ্য দিবসে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ রচিত হোক।

লক্ষাধিক জনসমাবেশের সম্মুখে মঞ্চে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এই সব কথা বলতে বলতে তারাশঙ্করের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখের কোণে জল জমে ওঠে তাঁর–যার স্পর্শ লেগেছিল সমাবেশে উপস্থিত সকলের মধ্যে। সম্মেলনে কর্মীমণ্ডলীর অন্যতম গাজিউল হক তখন তরুণ ব্যক্তি। পরবর্তীকালে সম্মেলনে তারাশঙ্করের কথায় হক সাহেব বলেছেন, 'এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, পরে তিনি আর যা বলেছিলেন তা মনের মধ্যে ঢোকার অবকাশ পায়নি।' ওপার বাংলার প্রতি এমন সহৃদয় দুর্বলতা তারাশঙ্করের হৃদয়ে আমৃত্যু বিরাজমান ছিল। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও বাংলাদেশের নতুন প্রকাশ মুহূর্তে তারাশঙ্কর বলেছিলেন–'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

সম্মেলন থেকে কলকাতা গিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন অন্নদাশঙ্কর রায়কে। বলেন, সম্মেলনের এক ফাঁকে এক সন্ধ্যায় ভাসানী তাঁকে [তারাশঙ্কর] ও প্রবোধ সান্যালকে নিয়ে গাঁয়ের পথে হাঁটতে বের হন গ্রাম দেখাতে। ভাসানী ধীরে হাঁটতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটা সম্ভব নয় বলে কিছুদূর গিয়ে প্রবোধ সান্যাল ফিরে আসেন জমিদার-বাড়িতে। তারাশঙ্কর ও ভাসানী হাঁটতে হাঁটতে যান অনেক দূর। হঠাৎ পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাসানী সাহেব তারাশঙ্করকে বলেন, পূর্ব বাংলা একদিন স্বাধীন হবে এবং ১০-১২ বছরের মধ্যেই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এই বাংলা। প্রাদেশিক পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি গ্রামের দিকে নির্দেশ করে বলেছিলেন, এই যে গ্রামগুলো দেখছেন, এখানে আগে অনেক হিন্দু পরিবার ছিল। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যার পর খোলকরতাল বাজিয়ে কীর্তনের আসর বসত। হিন্দুরা ভারতে চলে যাবার পর গ্রামগুলো দেখেন কেমন যেন প্রাণহীন নীরবতা পালন করছে। তারা ভারতে চলে যাওয়াতে পাকিস্তানের কোনো লাভ হয় নাই। তাদের আবার ফিরে পাওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি।

১৯৫৭ সালে ভাসানী সাহেব বলেছিলেন ১০-১২ বছরের মধ্যেই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হবে। বাংলাদেশের বুকে ১৯৭১ স্মরণে বিস্ময়ে অভিভূত করে ভাসানী সাহেবের দূরদর্শিতাকে। বাংলাদেশের মুক্তিকামী বিপ্লবের ইতিহাসে ভাসানী সাহেবের এই কথা স্মরণে রাখার মতো।

২.

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন থেকে ফিরে এসে তারাশঙ্কর ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় জওহরলাল নেহেরুকে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে সম্মেলনের বিশদ বিবরণ ভারত সরকারকে জানান। তারাশঙ্করের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা এই চিঠি কাগমারী সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কিত এক বিশেষ দলিল; আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিদেশ সরকারের প্রতিনিধি সাহিত্যিকের রিপোর্ট বলেই মনে করতে হয়। এই চিঠি থেকেই সম্মেলনের অন্দরমহলের অনেক কথা আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হওয়ার দাবি রাখে। চিঠিটি দীর্ঘ তবু এই কারণের জন্য এখানে তা তুলে ধরা হলো। 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার সমীপে' সম্বোধিত পত্রের রিপোর্টে তারাশঙ্কর লেখেন–

সর্বাগ্রে ভারত সরকারের প্রতি আমার ঐকান্তিক সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পাকিস্তান কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি দলে আমাকে অন্যতম প্রতিনিধি মনোনীত করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ; ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যাতায়াত ও সুখ সুবিধার যে সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং ঢাকার ডেপুটি হাইকমিশনের কর্মীবৃন্দ সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

এমন ক্ষেত্রে কাগমারীতে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছি তার বিবরণ জানানো এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি। কাগমারীতে এবং ফেরার পথে ঢাকায় ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল বিশেষ করে উভয় অঞ্চলের ভাষা বাংলা হওয়ার জন্য বাঙালী সাহিত্যিকবর্গ উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেছেন। লক্ষ্য করেছি, ওদেশের তরুণ তরুণী ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ মাতৃদুগ্ধের মত অকৃত্রিম। তাঁরা দলে দলে এসেছেন এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছেন; বাংলা বইয়ের যে অভাব অনুভব করেন তার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম তাঁদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গীতের ওখানে চর্চা সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারত সরকার ওখানে যে India Information Service নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সেখানে ৮০০০ হাজার বাংলা বই আছে। এই বইয়ের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে নিত্যই গড় ১৫০-২০০ পাঠকের সমাবেশ হয়। শুনলাম বর্তমানে এই জনপ্রিয়তার জন্য শঙ্কিত হয়ে পাকিস্তান গোয়েন্দা পুলিশ নিয়োগ করেছেন। আমি মনে করি–তাতেও মানুষ এখানে আসতে বিরত হবে না। প্রয়োজন আরও বইয়ের।

পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের এই প্রীতিকে খর্ব ও খণ্ডিত করার জন্যে দলীয় সংবাদপত্রগুলো নানান অপপ্রচার করে থাকেন। এবং সত্য সংবাদ প্রকাশ করেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি যে ডাঃ শহিদুল্লার মত ব্যক্তির ধারণা এই যে, Religious leader নিয়ে আলিগড়ে শোচনীয় এক রক্তাক্ত অধ্যায় ঘটে গেছে এবং মুসলিমেরা নির্যাতিত হয়েছে। কিন্তু ডাঃ জাকির হোসেনের বিখ্যাত বিবৃতির কথা তিনি আদৌ জ্ঞাত নন। এবং তাঁদের মত শিক্ষিত ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করেন যে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে মুসলীম লীগকে ভারতে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গেই একথা ওঠে এবং আমরা তাঁদের এই ধারণা দূর করবার জন্য সত্য সংবাদ জানাই। জানাই যে, মুসলীম লীগ এবার ইলেকশানেও প্রতিযোগিতা করছে। বলি ভারতবর্ষে আসুন এবং সত্য সংবাদ শুনে যান।

সম্মেলনে বাঙালী সাহিত্যিকদের বক্তৃতা সর্বাধিক অভিনন্দন লাভ করেছে। সর্বশেষ মৌলানা ভাসানীর কথা। এই ব্যক্তিটির মধ্যে আমি এক আশ্চর্য মানুষকে লক্ষ করেছি। যিনি মাটির মানুষের অতি আপন অন্তরঙ্গ এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের শিক্ষিত তরুণ তরুণী ও ছাত্র ছাত্রী সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশের অবিসম্বাদী নেতা। কাগমারী রাজনৈতিক সম্মেলনে যা ঘটেছে তার দ্বারাই এ সত্য সমর্থিত। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে তাদের তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখে এসেছি। এবং এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানে যে এক নবজাগরণ এসেছে একথা না বললে তথ্য অসম্পূর্ণ হবে। পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কমে এসেছে; সাম্প্রদায়িক কুফল তাঁরা অনুভব করছেন। মৌলানা ভাসানী নিজ মুখে আমাদের সঙ্গে তাঁবুর মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন–আমরা চাই হিন্দুরা আসুক, যেমন ছিল তেমনি থাকুক, তারা দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা করুক, যাত্রাগান-পাঁচালী ইত্যাদি গীতবাদ্যে উৎসব করুক। আমাদের জীবন নিরানন্দ হয়ে গেছে; আবার আনন্দ ফিরে আসুক। আমাদের শিক্ষক নাই, অধ্যাপক নাই, ডাক্তার নাই–তারা এলে আমাদের সে সব অভাব দূর হবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও অনেকে এই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। বহু সহস্র সাধারণ মানুষ সমবেত হয়েছিল তাদের দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলে এই কথারই সায় পেয়েছি। এই মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রতিপক্ষ প্রাণপণে কাশ্মীর কাশ্মীর ধ্বনি তুলছেন। তাতে কিছু অংশ বিভ্রান্ত হয় এ সত্য।

মৌলানা ভাসানী আসবার দিন একথাও বলেছেন–আমার ও প্রবোধ সান্যালের কাছে যে, তাঁরা প্রাদেশিক পূর্ণ স্বতন্ত্রতা অর্জন করতে চান এবং তাঁরা ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে চাইবেন এবং দেবেন। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এ কথা বলবার জন্যেও অনুরোধ করেন। আমরা এর উত্তরে নীরবই ছিলাম। আপনাদের কাছে জানালাম।

তারাশঙ্কর-বিবৃত কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের স্মৃতিচারণা শুনে সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তারাশঙ্করকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন–'খবরদার, একথা কাগজে প্রকাশ করবেন না। নয়তো ভাসানির জান যাবে।' সম্মেলনের কথা তারাশঙ্কর কলকাতার কোনো কাগজে প্রকাশ করেছিলেন কিনা তা আজও আমরা জানতে পারিনি কিন্তু ভারত সরকারকে সত্য প্রকাশে দ্বিধা করেননি।

অনলাইন অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, ভাসানী সাহেবের জীবনীকার বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক মাননীয় সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেব কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে দীর্ঘ গবেষণা করে একটি বই লিখেছেন; কিন্তু বইটি আজও আমাদের পড়ার সুযোগ হয়নি। এখানে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের রিপোর্ট স্বরূপ উদ্ধৃত তারাশঙ্করের পত্রটি–সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মনে রাখার মতো' বইতে মুদ্রিত হয়েছে। বিষয়টি তারাশঙ্কর অনুসন্ধানী এবং বাংলাদেশের সারস্বত সমাজের ভালো লাগলে আমাদের আনন্দ অনুভব হবে।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক
শহীদ আবুল কাশেম কলেজ

নাপিতের ট্রেড ইউনিয়ন

মুল্‌করাজ আনন্দ

অনুবাদ : বদিউর রহমান

অনূদিত গল্প

আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনে আমাদের গ্রামের নাপিতের ছেলে চাঁদুরও একটা বিশেষ অবস্থান আছে। আমি যদি ইতিহাসে ওর অবদানকে স্থায়ী স্বীকৃতি দিতে সচেষ্ট না হই তাহলে চাঁদু তার অবদানের স্বীকৃতি থেকে নির্ঘাত বঞ্চিত হবে। স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যে চাঁদুর এই দাবি এমন একটা অসাধারণ কাজের জন্যে–যার গুরুত্ব ওর নিজেরই জানা ছিল না। এ কথা সত্যি যে বর্তমান ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিখ্যাত মানুষের মতো ওর নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনো অতিরঞ্জিত ধারণা ছিল না। অবশ্য তাঁদের মতো একটা নির্বোধ অহমিকা ওর ছিল। সেই অহমিকাকে কখনো মনে হতো অসঙ্গত, আবার কখনো ভালোই লাগত।

যেসময়ে চাঁদু খালি গায়ে কোমর থেকে একফালি ন্যাকড়া জড়িয়ে ঘুরে বেড়াত তখন থেকে আমি ওকে চিনি। গ্রামের অলিতে গলিতে জল-কাদার মধ্যে দুজনে একসঙ্গে লুটোপুটি খেয়েছি, একসঙ্গে খেলেছি। কত খেলা, লড়াই-লড়াই, দোকান-দোকান, পুরুতগিরি নানা ধরনের কতো ছোটোখাটো খেলা। নিজেরা আনন্দ পাবার জন্যে এবং মাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে খেলাগুলো আমরা মাথা থেকে বের করতাম। গুরুজনদের মধ্যে একমাত্র মায়েরাই যা হোক আমাদের দিকে নজর রাখতেন

চাঁদু আমার চাইতে প্রায় ছ' মাসের বড়ো। চাঁদু সবসময়ে সব ব্যাপারে সর্দারি করত আর আমি স্বেচ্ছায় তা মেনে নিতাম। কারণ, বোলতা ধরা, টিপে বোলতার লেজের দিক দিয়ে বিষ বার করা, বোলতার পায়ে সুতো বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া–এসব ব্যাপারে ও ছিল সত্যিই প্রতিভাবান। আর আমি গ্রামের কুয়োর পাড়ে জলখাবার জায়গাটায় যেখানে বোলতার চাক, তার কাছাকাছি গেলেই বোলতাগুলো আমার গালে হুল ফুটিয়ে দিত।

বড়ো হয়েও মনে হয়েছে চাঁদু সব দিক দিয়ে নিখুঁত হওয়ার একটা জীবন্ত নিদর্শন। ও যেসব কাগজের ঘুড়ি তৈরি করে ওড়াত, সেগুলো এমন সুন্দরভাবে সাজানো আর টালনা খেয়ে এমন সুন্দরভাবে উড়ত–তেমন ঘুড়ি আমি কিছুতেই বানাতে পারতাম না।

এ কথা অবশ্য ঠিক–স্কুলে ও আমার মতো অংক কষতে পারত না। এর কারণ বোধ হয়, ওর বাবা ছোটোবেলা থেকেই ওকে জাত-ব্যবসা 'নাপিতগিরি'র কাজে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন। চুল কাটবার জন্য ওকে গ্রামেও পাঠাতেন। স্কুলের মাস্টারমশাই আমাদের যেসব বাড়ির পড়া দিতেন তা পড়ার মতো সময় ওর ছিল না। তবে সব সময়ই ও আমার চাইতে ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারত। ও যে শুধু পড়ার বইয়ের কবিতাগুলো তোতাপাখির মতো মুখস্থ বলে যেতে পারত, তা নয়, বইয়ের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা গদ্য লেখাও এমন গড়গড় করে বলে যেত যে কবিতার মতো মনে হতো।

চাঁদু স্কুলে বৃত্তি পেত আর আমাকে পড়তে হতো মাইনে দিয়ে। এ ব্যাপারটা আমার মায়ের কিছুতেই সহ্য হতো না। সব সময়ে তিনি আমাকে এই বলে ওর সঙ্গে খেলা করতে বারণ করতেন যে, চাঁদু ছোটোজাত, নাপিতের ছেলে–আমার উচিত জাত এবং বংশমর্যাদা রক্ষা করে চলা। কিন্তু আমি বংশ পরম্পরায় পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে আর যে সকল সংস্কারই পেয়ে থাকি না কেন, তাদের 'হামবড়া' ভাব যে পাইনি এ কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, রোজ সকালে যখন মা আমার কপালে শ্রেষ্ঠ বর্ণের চিহ্ন হিসেবে রক্ততিলক এঁকে দিতেন এবং সাজসজ্জা হিসেবে আমাকে পরিয়ে দিতেন সাবেকি ধরনের আচকান, চাপা পায়জামা, জরির কাজ করা জুতো আর রেশমি পাগড়ি–তখন আমার বরং লজ্জাই করত। ইচ্ছে করত চাঁদু যে ধরনের বিচিত্র আর চোখ ধাঁধানো পোশাক পরে সেগুলো যদি আমি পরতে পারতাম। চাঁদুর পোশাক ছিল অবসরপ্রাপ্ত সুবেদারের দেওয়া একজোড়া খাকি প্যান্ট, আগাগোড়া ঝিনুকের বোতাম দিয়ে বাহার করা রং-চটা কালো ভেলভেটের ওয়েস্টকোট আর একটা ফেলটের টুপি। এই টুপিটা একসময়ে ছিল আমাদের গ্রামের উকিল লালা হুকুম চাঁদের।

চাঁদুর বাবা প্লেগে মারা যাওয়ার পর ওর চলাফেরায় আর কোনো বাধা নিষেধ রইল না। তা দেখে আমার ভীষণ হিংসে হতো। তখন থেকেই ও সকালে উঠে প্রথমে একটা চক্কর দিয়ে বড়ো জাতের বাবুদের বাড়িবাড়ি গিয়ে চুলকাটা, দাড়ি কামানোর কাজ শেষ করে আসত। তারপর স্নান ও সাজসজ্জা সেরে চলে যেত শহরে–লালা হুকুম চাঁদ যে চারদিক বন্ধ গাড়িতে শহরে যেতেন তারই পাদানিতে লুকিয়ে বসে।

আমার ওপর খুব সদয় ছিল চাঁদু। ও জানত আমাকে কালেভদ্রে কেউ শহরে নিয়ে যায়। তাছাড়া, আমাকে প্রতিদিন দীর্ঘ তিন মাইল পথ ভেঙে ভগবানের নাম জপ করতে করতে যেতে হয় বড়ো গ্রামের জোয়া দিয়ালার মাধ্যমিক স্কুলে। ও কিন্তু দয়ামায়াহীন মাস্টারের হাতে বেত খাওয়ার অগ্নিপরীক্ষা থেকে চিরদিনের জন্য রেহাই পেয়ে গেছে। বাবা মারা যাবার পরেই চাঁদু স্কুল ছেড়েছে। এসব কথা ভেবে রোজই শহর থেকে আমার জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসত। যেমন ছবি আঁকার তুলি, সোনালি কালি, সাদা চক বা পেনসিল কাটার দুফলা ছুরি এই সব। আর শহরের বাজারে যে সকল বিচিত্র জিনিস দেখে আসত তার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে আমার সঙ্গে গল্প জমাত।

বিশেষ করে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা দিত জেলা-আদালতে সাহেব উকিল-চাপরাশি-পুলিশের চমৎকার সব বিলেতি ধাচের পোশাকের। লালা হুকুম চাঁদের ফিটনের পিছনে চেপে বাড়ির পথটুকু পাড়ি দেবার জন্যে রোজই ওকে জেলা-আদালতে অপেক্ষা করতে হতো। সেখানেই এসব ওর চোখে পড়ত। দু-একবার মনের গোপন ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে আমার কাছে। বলেছে–ব্যবসার দক্ষতার জন্যে ওর যে উদ্বৃত্ত আয় তা ওর মা একটা ঘড়ায় রেখে দেন। সেখান থেকে কিছু টাকা চুরি করে নিয়ে দাঁতের ডাক্তার কালান খাঁর মতো পোশাক কিনবে। শহরে নাকি কালান খাঁর আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা পাটিকে পাটি দাঁত বসিয়ে দেন মানুষের মুখে, নতুন চোখ পর্যন্ত লাগান। কালান খাঁর চেহারার একটা বর্ণনাও দিয়েছে আমার কাছে। ছোকরামতো চেহারা, একপাশে পাট করা চুল, কড়া ইস্ত্রি করা শার্ট, হাতির দাঁতের মতো চকচকে কলার, 'বো' দেওয়াটাই, কালো কোট, ডোরাকাটাপ্যান্ট, ভারি চমৎকার রবারের ওভারকোট, পাম্প-শু ইত্যাদি। তারপর ও আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছে কী রকম দক্ষতার সঙ্গে এই অদ্ভুত কর্মা লোকটি বিলিতি চামড়ার হাতব্যাগ খুলে ইস্পাতের ঝকঝকে যন্ত্রপাতি ফসফস করে টেনে টেনে বের করেন।

চাঁদু আমার কাছে জানতে চাইত–প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া নাপিত ও, ও যদি ডা. কালান খাঁর মতো সাজপোশাক পরে, তাহলে ওকে আরও বেশি উঁচুদরের লোক মনে হবে কিনা?

ও বলত–'আমি যদিও মস্ত বড়ো পাশ করা ডাক্তার নই, তাহলেও ব্রণ, ফোঁড়া বা শরীরের কাটাকুটি কী করে সারাতে হয় তা আমি বাবার থেকে শিখে নিয়েছি। আমার বাবা শিখেছেন তাঁর বাবার কাছে থেকে।'

ওর এসব পরিকল্পনায় আমি সায় দিতাম। এই আদর্শ পুরুষের সকল চিন্তা এবং কাজে আমার প্রবল আগ্রহ, সেই আগ্রহ নিয়েই উৎসাহিত করতাম ওকে।

একদিন সকালে আমাদের বাড়ির দরজায় চাঁদুকে দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। মাথায় সাদা পাগড়ি, গায়ে সাদা কোট (গায়ে একটু বড়ো হলেও দেখতে বেশ চমৎকার), পায়ে পাম্প-শু। জুতোর চামড়ায় সেলুলয়েটের ছবির মতো আমার মুখের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। রোজকার মতো ও চকুরে বেরিয়েছে। আমাকে দেখাতে এসেছে এই নতুন সাজপোশাকে ওকে কেমন মানিয়েছে।

আমি বললাম–'বাহ্, চমৎকার!'

তারপর জমিদার বাড়ির দিকে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। রোজ সকালে ও জমিদারের দাড়ি কামায়। আমিও ওর পিছন পিছন চললাম।

এই সময়ে রাস্তায় বেশি লোক থাকে না, চাঁদুর এই ডাক্তারি সাজের জাঁকজমক দেখার মতো একমাত্র আমিই সঙ্গের সাথি। চাঁদু নিজেও এ-বিষয়ে বেশ সচেতন ছিল। দেয়ালে গ্রামের মেয়েদের দেওয়া ঘুঁটের দাগ আর নালার নোংরা জল থেকে নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে সগর্বে পথ চলছিল চাঁদু। জমিদারবাড়িতে ঢুকতেই জমিদারের ছোটো ছেলে দেবীর সঙ্গে দেখা। সে আনন্দে হাততালি দিয়ে চিৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিলো যে চাঁদু নাপিত মিশনারি স্কুলের পাদ্রি সাহেবের মতো জমকালো সাজপোশাক পরে এসেছে।

বেশ নাদুসনুদুস চেহারা জমিদার বিজয় চাঁদের। সবেমাত্র পায়খানা থেকে বেরিয়েছেন, সুতরাং কানে পৈতে জড়ানো, সেই পৈতে ছুঁয়ে চিৎকার করে উঠলেন–'রাম! রাম! রাম! শুয়োরের বাচ্চা, গরুর চামড়ার ব্যাগ নিয়ে আমার বাড়ির ভিতর এসেছিস! ব্যাটার গায়ের জামাটা কোন জানোয়ারের চর্বি দিয়ে তৈরি কে জানে, আর পায়ে অপবিত্র সাহেবি জুতা। বেরো এখুনি! বেরো বলছি! বেটা শয়তানের হাঁড়ি। আমার ধর্ম খোয়াতে চাস নাকি? বাপ মরে গিয়ে ডরভয় আর নেই!'

'জায়গিরদার সাহেব, আমি যা পরেছি তা তো বদ্যিরাও পরে'–চাঁদু বলল।

'দূর হ' হারামজাদা, তুই যেমন নিচুজাতের নাপিত তেমনি জামাকাপড় পরবি। ফের যদি তোর এসব বেয়াড়া বদখেয়াল দেখি তো চাবকাব ধরে'।

'কিন্তু রায় বিজয় চাঁদ সাহেব'–চাঁদু অনুনয় বিনয় করে বলতে চায়।

জমিদারবাবু চিৎকার করতে লাগলেন–'দূরহ!' বেরো! বেটা অপদার্থ। যেখানে আছিস থাক, সামনে এগুবি না, তাহলে আবার সারাবাড়ি গোবর দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে'।

চাঁদু ফিরে এলো। সারামুখ টকটকে লাল, বেশ দমে গেছে চাঁদু। আমার কাছে ও যে একজন কেউকেটা তা ওর জানা ছিল। আমার সামনেই এমন অপমানের লজ্জায় আর আমার দিকে ফিরে তাকাতে পারলো না। হনহন করে এগিয়ে গেল নাথুরামের দোকানের দিকে। নাথুরাম গ্রামের সাহুকার, গলির কোণে তার মুদির দোকান।

জমিদারের ছেলে দেবী বাপের দাবড়ানি শুনে কাঁদতে শুরু করেছিল।

তাকে শান্ত করবার জন্যে আমি একটু দাঁড়ালাম। তারপর বাইরে এসে গলির মোড়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল সাহুকার তার ধানচাল মাপার দাড়িপাল্লাটা একহাতে উঁচিয়ে ধরে কুৎসিত ভাষায় চাঁদুকে গালিগালাজ করছে।

'বেটা নেংটি শুয়োর। কোথায় সংসারের ভার নিবি, বুড়িমাকে দেখাশোনা করবি, তা না, সং সাজবার শখ হয়েছে। হাসপাতালের লোকগুলোর নোংরা জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ানো! যা, ফিরে গিয়ে নিজের জামাকাপড় পরে আয়। তবেই তোকে দিয়ে চুল কাটাবো'। কথা বলতে বলতে সে মাথার উপরের 'ধর্মের সাক্ষী' গেরো দেওয়া চুলের গোছায় (টিকি) হাত দিল।

চাঁদু একেবারে দমে গেল এবং প্রচণ্ড রাগে ছুটে বেরিয়ে গেল আমার পাশ দিয়ে। যেন আমিই সকল দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। আমি বড়ো জাত বলে ও আমাকে ঘৃণা করছে এমন কথা ভাবতেই আমার কান্না পেল।

পিছন থেকে চিৎকার করে বললাম–'পরমানন্দ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বল, তুই যে পোশাক পরেছিস তাতে দোষের কিছু নেই'।

'ও, তুমিও ওটার সঙ্গে তাল দিচ্ছ!' জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে পণ্ডিত পরমানন্দ বললেন। দেখে মনে হলো, এত বড় একটা অনাচার ঘটায় যে জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্যেই পণ্ডিত পরমানন্দের ডাক পড়েছে।

'স্কুলে শিক্ষা পেয়ে ছেলেগুলো সব গোল্লায় গেছে। আচ্ছা, তুই না হয় লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হবি, তোর এসব পরলে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ঐ ছোটজাতের ছেলেটার এত সাজপোশাকের বাহার কেন? দাড়ি, মাথা, হাত, সমস্ত ছোঁয় আমাদের। ভগবানই তো ওকে যথেষ্ট অচ্ছুৎ করেছেন, আরও অচ্ছুৎ হবার প্রয়োজনটা কী ওর? তোর কথা আলাদা, তুই বড়ো জাতের ছেলে। কিন্তু ওব্যাটা নিচু জাতের, ব্যাটা শয়তান, পাজির পা-ঝাড়া'।

কথাগুলো চাঁদু শুনেছিল। ও আর ফিরে তাকাল না, ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। দেখে মনে হলো গালাগাল শুনে যে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে তা নয়। বরং ওর মাথায় কী যেন একটা নতুন মতলব এসেছে সেজন্যেই এত তাড়া।

আমার মা আমাকে ডেকে পাঠালেন–নাওয়া-খাওয়া সেরে স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হতে বললেন। নইলে দেরি হয়ে যাবে। এই সুযোগে নাপিতের ছেলের সঙ্গে আমার মেলামেশা নিয়ে আর এক দফা বক্তৃতা দেবার লোভও সামলাতে পারলেন না।

তবুও চাঁদুর অদৃষ্টের কথা ভেবে সারা দিন ভয়ানক অস্বস্তিতে কাটালাম। স্কুল থেকে ফেরার পথে যে ঠুপরি ঘরে চাঁদু আর ওর মা থাকে সেখানে গেলাম।

খিট্‌খিটে বুড়ি বলে ওর মা সবার কাছে পরিচিত। বড়ো জাতের মানুষ রানি জেদের আসল রূপ দেখতে চায় না, কিন্তু এই ছোটো জাতের বুড়ি চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিতেন। সবাই তাকে বলে খিট্‌খিটে বুড়ি। আমারও পর তিনি বেশ সদয় ছিলেন–তবে আমার সঙ্গেও কথা বলতেন খোঁচা দিয়ে। পুরো ষাটটা বছরের অপমান আর নির্যাতনে তাঁর কথা বলার ধরনটাই এমন হয়ে গিয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, বন্ধুর খোঁজে আসা হয়েছে বুঝি, তা বেশ। তোমার মা যদি টের পান যে তুমি এখানে এসেছে তাহলে তোমার চাঁদমুখের ওপর কুনজর দিয়েছি বলে আমার চোখদুটো উপড়ে ফেলবেন। তুমি দেখতে তো বেশ গো-বেচারা ভালো মানুষ, তোমার মনটাও কি সে রকম? না কি তোমাদের দলের লোকদের মতো তুমিও একটি পাকা ঘুঘু–মুখে এক, মনে আর এক'?

'চাঁদু কি বাড়ি নেই মা'? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এবার তিনি আন্তরিক ও সরল সুরে বললেন–

'জানি না বাছা। বলল তো শহরে গিয়ে রাস্তার ধারে লোকের দাড়ি কামিয়ে কিছু আয় করেছে। কী জানি বাপু কী ওর মতলব। বাপের আমলের মক্কেলদের এভাবে চটানো ওর ঠিক হচ্ছে না। ছোটো ছেলে, মাথায় নানা রকম উদ্ভট খেয়াল চাপে। এতে কি ওদের রাগ করা উচিত? ও তো একেবারেই ছেলেমানুষ। ওর সঙ্গে খেলতে যাবে বলে দেখা করতে এসেছ বুঝি? আচ্ছা, ও এলে বলব। এই তো গেল–এই বড়ো রাস্তাটার দিকেই মনে হয় গেছে'।

সাইকেল কেনার ব্যাপারে চাঁদু এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দরাদরি করল যে ওর ব্যবসায়ী দক্ষতা সম্বন্ধে আমার নতুন জ্ঞান হলো। ও যে রকম বেপরোয়াভাবে টাকা-পয়সা ওড়াত তা দেখে কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও আমার মনে হয়নি যে ওর এমন দক্ষতা আছে

'আচ্ছা মা', বলে আমি বাড়ি ফিরলাম।

বিকেলে যথারীতি সাংকেতিক ভাষায় শিস দিয়ে চাঁদু আমাকে ডাকল। অভিভাবকেরা আমাদের মেলামেশায় রেগে গিয়ে বাধা দিতেন, তাদের বকুনির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এই সাংকেতিক শিসের ব্যবস্থা।

চাঁদু বলল–'চল, হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে যাই, কথা আছে'।

ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসতেই বলতে শুরু করল–'জানিস, আজ সকালে আদালতের কাছে চুল কেটে আর দাড়ি কামিয়ে এক টাকা আয় হয়েছে। হুকুম চাঁদের গাড়ির পিছনের হাতলে চেপে বিকেল না হতেই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো, নইলে আরও বেশি আয় হতো। শোন, আমি বলে রাখছি, এই ধর্মপুত্তুর হাবাগুলোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। আমি স্ট্রাইক করব। কোনো কাজে কিছুতেই আর ওদের বাড়ি মাড়াবো না। লালা হুকুম চাঁদের জুয়াড়ি ছেলেটার কাছ থেকে পাঁচ টাকার একটা জাপানি সাইকেল কিনে সাইকেল চড়া শিখে সেই সাইকেলে চড়ে রোজ শহরে যাব। ওভারকোট, কালো চামড়ার জুতো আর সাদা পাগড়ি মাথায় দিয়ে যখন সাইকেলে চাপব তখন চমৎকার দেখাবে না আমাকে? আর কি জানিস, আমার যন্ত্রপাতির ব্যাগটা ঝুলিয়ে নেবার জন্যে দু'চাকা গাড়িটার সামনের দিকে একটা হুকও আছে'।

রীতিমতো উচ্ছসিত হয়ে সায় দিলাম। চাঁদুর সাইকেলে চাপার গৌরব কল্পনা করে নয় বরং আমারই একটা উচ্চাশা প্রায় বাস্তব হতে চলেছে এই ভেবে। মনে মনে ভাবলাম, চাঁদু যদি একটা সাইকেলের মালিক হয়, তাহলে সাইকেল চালানো শেখার জন্যে হয়তো যখন তখন আমাকে সাইকেলটা ছেড়ে দেবে না–অন্তত পিছনের চাকার বলটুর ওপর দাঁড় করিয়ে মনের রডে বসিয়ে শহরে কি আর নিয়ে যাবে না?

সাইকেল কেনার ব্যাপারে চাঁদু এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দরাদরি করল যে ওর ব্যবসায়ী দক্ষতা সম্বন্ধে আমার নতুন জ্ঞান হলো। ও যে রকম বেপরোয়াভাবে টাকা-পয়সা ওড়াত তা দেখে কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও আমার মনে হয়নি যে ওর এমন দক্ষতা আছে।

চাঁদু আমাকে চুপিচুপি বলল–'দু'একদিন সবুর কর। দেখ না কী কাণ্ড তোকে দেখাই। তুই এমন হাসাহাসবি যে আগে এরকম আর কোনোদিন হাসিসনি'।

'দু'একদিন না, এখনই বলতে হবে'–অধৈর্য হয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। ওর দুঃসাহসিকতার ভাব এবং তার উত্তেজনার রেশ আমার চেতনায়ও সঞ্চারিত হলো। আমি আরও বেশি অধৈর্য হয়ে পড়লাম।

ও বলল–'না, তোকে সবুর করতেই হবে। এখন শুধু একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে পারি। এ যে কী রহস্য তা একমাত্র নাপিতরাই বুঝতে পারে। এবার আয় সাইকেল চড়াটা শিখে নেওয়া যাক। তুই সাইকেলটা শক্ত করে ধরে থাক আর আমি উপরে উঠি–সেই ঠিক হবে, তাই না?'

আমি বললাম–'কিন্তু এভাবে তো সাইকেল চড়া শেখা যায় না। আমার বাবা সাইকেল চড়া শিখেছিলেন চাকার বেরিয়ে আসা বল্টুর উপর পা দিয়ে। আমার ভাই শিখেছিল প্রথমে প্যাডেলে পা দিয়ে ব্যালান্স করবার চেষ্টা করে।'

চাঁদু বলল–'তোর বাবা তো একটা কুমড়োপটাশ আর ভাইটাল্যাংপ্যাংসিং'।

আচ্ছা বেশ', বলে আমি সাইকেলটা ধরলাম। কিন্তু সাইকেলের

পালিশ করা চকচকে রডগুলোর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে থাকতে থাকতে আমার হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। চাঁদু সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে ধড়াম করে উল্‌টো দিকে পড়ে গেলো।

সাহুকারের দোকানে জমিদারকে ঘিরে কয়েকজন চাষি জড়ো হয়েছিল, সেখান থেকে হো হো শব্দে হাসির রোল উঠল। তারপর সাহুকরকে চিৎকার করে বলতে শোনা গেল–'ঠিক হয়েছে। কলিরকুপুত্তুর, হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে না মরলে তোর শিক্ষা হবে না, বেটা ভুইফোঁড় দাস!'

লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেল চাঁদুর। বিড়বিড় করে আমাকে গালাগাল দিয়ে উঠল–'হাঁদারাম, তুই কোনো কাজেরই না। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম ওর এই দুর্গতির জন্যে আমার ঘাড় চেপে ধরে কয়েক ঘা বসিয়ে দেবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে হেসে বলল–'আচ্ছা, দেখে নেব শেষ পর্যন্ত কার হাসি থাকে, আমার না ওদের'।

'এবার আমি সাইকেলটা খুব শক্ত করে ধরে থাকব'–আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলো বলে সাইকেলটা মাটি থেকে তুলে নিলাম।

জমিদারের হুংকার শোনা গেল–'শুয়োরের বাচ্চার হাড়গোড় ভাঙুক!'

চাঁদু বলল–'ওদের কথায় কান দিস না! ওদের আমি দেখিয়ে দেব'।

আমি এবার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাইকেলটা ধরে রাখলাম আর চাঁদু সাইকেলের উপর চেপে বসল। তারপর বলল–'ছেড়ে দে!'

আমি হাতের মুঠো ছেড়ে দিলাম।

ডান পা দিয়ে জোরে নীচের দিকে প্যাডেলের উপর চাপ দিয়েছে চাঁদু। চাকা দুটো ঘুরতে শুরু করতেই বিপজ্জনকভাবে একপাশে কাত হয়ে পড়ল। এর মধ্যেই চাঁদু অন্য প্যাডেলের উপর চাপ দিয়েছে। ডানদিকে একটু হেলে সাইকেলটা ভারসাম্যে ফিরে এলো। এবার অত্যন্ত বিপজ্জনক ভঙ্গিতে চাঁদু সিট থেকে পাছাটা তুলে ধরেছে। প্রায় পড়োপড়ো অবস্থায় মুহূর্তের জন্য ঝুলে রইল, হাতলটা সাংঘাতিকভাবে একেবেঁকে যাচ্ছে, টলে পড়ার মতো অবস্থা। এমন সংকট মুহূর্তে দোকানের জটলা থেকে হাসি আর ঠাট্টার মিলিত শব্দ ভেসে এলো। আমার মনে হলো চাঁদুর নিজের চরম অক্ষমতার জন্য না হলেও এই গোলমালের জন্যই ওকে বিপদে পড়তে হবে। আশ্চর্যই বলতে হবে–কী করে যেন চাঁদুর পা দুটোর গতি ছন্দের সঙ্গে মিলে গেলো। হাতের মুঠোর হাতলটা আর টলছে না। সাইকেল চালিয়ে ও এগিয়ে চলল আর আমি প্রবল উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাবাস! সাবাস!' বলে পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলাম। আধ মাইল গিয়ে চাঁদু আবার সেভাবেই ফিরে এলো।

চাঁদুর এই নবার্জিত দক্ষতার আনন্দের অংশীদার হওয়ার জন্যে আমি খুবই উৎসুক ছিলাম। কিন্তু পরের দিন আর চাঁদুর সঙ্গে দেখা হলো না। স্কুল থেকে আমাকে সোজা নিয়ে যাওয়া হলো ভেরকা গ্রামে মাসির সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

তৃতীয় দিন চাঁদু আমাকে ডেকে বলল, সেদিন যে মজার কথা বলেছিল আজ তা আমাকে দেখাবে। তাড়াতাড়ি ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। পথ চলতে চলতে বারবার জিজ্ঞেস করলাম– 'কী মজা, একটু বল না'।

গ্রামের কুমোরের চুল্লির পিছনে লুকিয়ে চাঁদু বলল–'তাকিয়ে দ্যাখ–সাহুকারের দোকানে একটা জটলা দেখতে পাচ্ছিস? ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখ ওরা কারা'।

সকল মুখগুলো তন্নতন্ন করে দেখে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। বললাম–'ও তো চাষিরা বসে জমিদারের জন্যে অপেক্ষা করছে'।

চাঁদু বললো–'গাধা কোথাকার! আবার ভালো করে দ্যাখ। ওই তো জমিদার বসে আছেন। খেউরি না করে লম্বা চোয়ালওয়ালা মুখটা সাদা দাড়ির জঙ্গলে কী রকম বিশ্রী হয়ে আছে দেখেছিস'?

'হোঃ, হোঃ হোঃ!' জমিদারের মোটা ঘন গোঁফের পাশে (আমি জানতাম জমিদার গোঁফে কলপ দেয়) চোয়ালের উপর খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ির জঙ্গল এত বেশি বেমানান যে মজা পেয়ে আমি জোরে শব্দ করে হেসে উঠলাম।

'হোঃ, হোঃ!' ঠিক যেন একটা সিংহ ধুঁকছে। একেবারে কাহিল অবস্থা!'

'চুপ, চুপ!' চাঁদু শাসিয়ে উঠল, 'চেঁচাসনে। একবার সাহুকারকে দ্যাখ। ওর হাঙরমুখো গোঁফ এতদিন আমি ছেঁটে দিতাম। এখন গোঁফে তামাকের বাদামি ছোপ পড়ে ঠিক যেন কুষ্ঠরোগীর মতো দেখাচ্ছে। এবার তুই একটা কাজ কর–'গুঁফো ইঁদুর, গুঁফো ইঁদুর' বলতে বলতে দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যা। তোকে তো আর কিছু বলতে পারবে না'।

চাঁদুর এসব দুষ্টুমি বুদ্ধিতে আমি ছিলাম একান্ত অনুগত অনুচর। ভালোমন্দ হিতাহিত কিছুই গায়ে মাখতাম না।

'গুঁফো ইঁদুর, গুঁফো ইঁদুর' বলতে বলতে আমি দোকানের পাশ দিয়ে অশ্বত্থতলা পর্যন্ত জোরপায়ে হেঁটে গেলাম।

দোকান ঘিরে যে সকল চাষি জটলা করছিল তারা হাসিতে ফেটে পড়ল। মনে হলো অনেক ক্ষণ থেকেই তারা উস্‌খুস্‌ করছিল। বয়স্কদের মুখভর্তি ঘন দাড়ি তারা আগেই লক্ষ করেছে, তবে কিছু বলতে সাহস পায়নি।

'ধর, ধর, ওই খুদে শয়তানটাকে ধর। ওই নাপতে ছোঁকড়া চাঁদুর সঙ্গে ওটারও যোগ আছে', সাহুকার চিৎকার করে বলে উঠলেন।

ততক্ষণে আমি অশ্বত্থগাছটায় উঠে পড়েছি। সেখান থেকে মন্দিরের দেওয়ালের উপর লাফিয়ে পড়ে পুরুতকে লক্ষ্য করে আবার সেই চিৎকার জুড়ে দিলাম–'গুঁফোইঁদুর, গুঁফোইঁদুর'।

চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, নাপিতের ছেলে ধর্মঘট করেছে। বড়োদের খেউরি না করা দাড়ি নিয়ে ঘুরেঘুরে খুব ঠাট্টা-তামাশা চলছে।

গ্রামের বড়োজাতের মানুষ আর কর্তাব্যক্তিদের পরিবার-পরিজন ও বড়োদের এমন ভূতের মতো চেহারা দেখে হেসে লুটোপাটি খাচ্ছে, বাঁকা মন্তব্য করছে।

শোনা গেল, আর কেউ না হোক, জমিদারের বউ নাকি শাসিয়েছে যে সে কারও সঙ্গে পালিয়ে যাবে। এমনিতেই সে স্বামীর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোটো, তবুও স্বামী যতদিন ফিটফাট ছিলো সে সহ্য করেছে। এবার নাকি স্বামীর ওপর তার এমন বিতৃষ্ণা এসে গেছে, আর মানিয়ে চলা যাবে না।

এদিকে এই ক'দিন শহরে চাঁদুর ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে। কিছু পয়সাও জমেছে হাতে। নিজের জন্যে নতুন নতুন জামাকাপড়, যন্ত্রপাতি আর আমার জন্যে নানা ধরনের উপহারও কিনেছে।

গ্রামের মাতুব্বররা ভয় দেখাল এই অপরাধের জন্যে ওকে জেলে পাঠাবে।

চাঁদুর মায়ের ওপর হুকুম জারি হলো, শাস্তি ভঙ্গের অপরাধে চাঁদুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার আগেই যেন ওর মা ওকে বড়োদের কথা শুনতে বাধ্য করান।

চাঁদুর মা জীবনে এই প্রথম সুখের মুখ দেখছেন। এদের সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা তিনি তা বললেন। এতকাল যে ভাষায় বলেছেন এখন তার চাইতেও স্পষ্ট আর সোজা ভাষায়।

গ্রামের মাতুব্বররা ঠিক করলেন, ভেরকা গ্রামের নাপিতকে এনে কাজকর্ম চালাবেন। ঠিক হলো চাঁদুকে তারা দু'পয়সা করে দিতেন, ভেরকা গ্রামের নাপিতকে দিবেন একআনা করে।

এর মধ্যে চাঁদুর মাথায় একটা নতুন মতলব এসে গেছে–এত নতুন যে, এতকাল যা কিছু সে ভেবেছে তার কোনো কিছুর সঙ্গেই এর তুলনা হয় না। শহরের নাপিত নৃপেন দাসের দোকানটা দেখে তারও মাথায় বুদ্ধি খেলেছে বাজারের মাথায় বড় রাস্তার ধারে ঠিক ওইরকম একটা দোকান খুলবে। ভেরকা গ্রামের নাপিত ওর খুড়তুতো ভাই ধুনু। আর গ্রামের সাত মাইলের মধ্যে যেখানে যত গ্রামের নাপিত আছে সবাই হবে এই দোকানের অংশীদার-মালিক। খুড়তুতো ভাই ধুনু, আর আশপাশের গ্রামের সকল নাপিতকে নিয়ে একটা বিশেষ সভা ডেকে নিজের নতুন পরিকল্পনার কথা সবাইকে জানালো চাঁদু। হৃদয় আর মস্তিষ্কের নানান গুণ ছাড়াও ওর ছিল কথা বলার দারুণ দক্ষতা। সবাইকে বুঝালো, এবার সময় এসেছে দাড়ি কামাবার জন্যে গ্রামের মাতুব্বরদের ওদের কাছে আসতে হবে। ওরা আর প্রভুদের বাড়িবাড়ি হুজুর হুজুর করে ছুটোছুটি করবে না।

বদিউর রহমান
অধ্যাপক ও সাংবাদিক
সভাপতি, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী

যেই কথা সেই কাজ।

'রাজকোট জেলা নরসুন্দর ব্রাদার্স–চুলকাটা ও দাড়ি কামানোর দোকান'-এর দেখাদেখি আমাদের অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের অনেকগুলো সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল।

ধারাবাহিক উপন্যাস

বহ্নিলতা

অমর মিত্র

বছরে দুবার গাঁয়ে যায় মেয়ে। গরমের ছুটিতে আর পুজোয়। সেই ফাল্গুনে নন্দীগ্রামে গুলি চলল। তারপর থেকে মিছিল আর মিছিল। মানুষ যে ঘরের বাইরে বেরিয়েছে, আর যেতেই চাইছে না। বরং যারা তখনো ছিল গৃহবন্দি হয়ে, তারাও ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। গরমে মথুরগঞ্জে দিয়ে আসবে ভেবেছিল সুশান্ত। মা-বাবার কাছে আম-কাঁঠালের ছুটি কাটিয়ে আসুক। কিন্তু চারদিক যেমন অশান্ত হয়ে উঠেছিল, বহ্নিশিখা ছাড়তে চাইল না মেয়েকে। পুজোয় যাবি মা। আমরাও যাব। দিয়ে আসব। আবার পুজোর পর নিয়ে আসব। বহ্নিশিখার মনে হচ্ছিল অশান্তিটা কমুক। কিন্তু কমছিল না। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে সব। পুজোর সময় সবদিক শান্ত ছিল। তারা মহালয়ার পর চলল মেয়েকে নিয়ে। বহ্নিলতার মা বাবার জন্য শাড়ি পাঞ্জাবি, পায়জামা কিনল, নিতাইহরি আর যমুনাবুড়ির জন্য ধুতি আর শাড়ি। গেল বহ্নিশিখা আর সুশান্ত। সুশান্ত তো আগে গিয়েছিল। বহ্নিশিখা যায়নি কখনো সুন্দরবনে। টাকি হাসনাবাদ যাওয়া আর সুন্দরবনের অন্তঃস্থলে যাওয়া এক নয়। সেই হাসনাবাদে ডাঁসা নদী পার হয়ে ওপার থেকে ট্রেকার চাপল সকলে

নদী যে ইছামতী নয় তা বলল বিশ্বনাথ গায়েন। হ্যাঁ, বিশ্বনাথ গায়েন তাদের সঙ্গী হয়েছিল হাসনাবাদ থেকে। টাকিতে ইছামতী, সেই নদীর ওপারে বাংলাদেশ। শুনে বহ্নিলতা বলল, তাদের দেশ ছিল, ঠাকুমার কপোতাক্ষ আর ঠাকুদার বেতনা। বিশ্বনাথের কথা তিনজনই মন দিয়ে শুনছে। বহ্নিলতাও ভালো চেনে না এখনো এই পথ। চিনবে বড় হতে হতে। সেই কতদিন বাদে বহ্নিলতা ফিরছে বাড়ি। মায়ের কাছে, বাবার কাছে, ঠাকুমা ঠাকুদার কাছে। নিতাইহরি এখনো কোমর সোজা করে হাঁটতে পারে। চোখ কাটিয়েছে গেল সনে। যমুনাবুড়ি বসে বসে নিজের মনে ছড়া কাটে, নাতনিটা শুনত, এখন শোনার কেউ নেই। নাতির বারমুখো মন হয়েছে। শুনে মনে রাখার কেউ নেই। বিশ্বনাথই বলছে সব। মাসে মাসে একটা টাকা দেয় সুশান্ত বহ্নিলতার বাবাকে। বিশ্বনাথ দিয়ে আসে। মানি অর্ডার করলে সে টাকা মেরে দেবে পোস্ট মাস্টার। প্রাক্তন বিপ্লবী বিশ্বনাথের কাজ এখন এই। মানুষের পাশে দাঁড়ানোও তো বিপ্লবীর কাজ। মনে মনে তাই জানে প্রাইমারি টিচার বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, পোস্ট অফিসে এসে গেলেও সে টাকা বিলি হয় না। এমনি হয়েই থাকে। সুন্দরবনের কত পুরুষ বাইরে গেছে কাজ করতে। তাদের পাঠানো টাকা কখনো প্রাপক পায়, কখনো তা দিকহারা গাঙের পানিতে হারিয়ে যায়। ডাঁসা নদী পার হয়ে ট্রেকার যাত্রায় বিশ্বনাথের কাছে বহ্নিলতা কেন সুশান্ত বহ্নিশিখাও চিনে নিতে থাকে তাদের যাত্রাপথ। পথ চিনে নিতে থাকে তিনজনে। বিশ্বনাথ গায়েন বলে, এই যে বামদিকে যে গ্রাম, রামেশ্বরপুর নাম। এই পুরের ঘোষেরা সব কলকাতার বেলগাছিয়া থাকে। তারা আসে মাঝেসাঝে। কলকাতা খেয়ে নিয়েছে তাদের। ইদানীং পার হতে খুব দেখি না। রাস্তার দুপারে সজল সবুজ বৃক্ষেরা পথের উপর ছায়া মেলে আছে। আচমকা তারা উধাও হয়ে যায়। দুধারেই মাঠ আর মাঠ। মাঠ পার হয়ে ইছামতী আছে। ইছামতীর ওপারে বাংলাদেশ। এই যে আমরা যাচ্ছি, এ তো এক দ্বীপ। এই গ্রামের নাম বরুনহাট। বড় গঞ্জ। তারা দেখল দোকানপাট, ঘরবাড়ি, মানুষজন, বেচাকেনা। ভ্যান রিকশা ডাকছে প্যাসেঞ্জারদের, কাটাখালি, কাটাখালি। কাটাখালিতে এখন ব্রিজ হয়েছে। বিশ্বনাথ গায়েন বলে যাচ্ছিল। এই নদীর নাম গৌড়েশ্বর। আসলে ইছামতীকে রায়মঙ্গল নদীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল এই খাল কেটে। ইছামতীর ওই ওপার দেখা যাচ্ছে। ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা। পার হলেই অন্য দেশ। শুনতে শুনতে বহ্নিলতা বলল, আমাদের দেশ ছিল গো মা, বেতনা বলে এক নদী আছে ওপারে, তার ধারে যুগীপোতা গ্রাম।

বিশ্বনাথ গায়েন বলছিল, প্লাবনে প্লাবনে সেই কাটাখাল হয়ে গেছে গৌড়েশ্বর নদী। ট্রেকার চলছে। এরপর যে গঞ্জ এল, তা স্যান্ডেলের বিল। বিলিতি এক স্যান্ডেল সায়েব জঙ্গল হাসিল করে এখেনে জমিদারি পত্তন করেন। তাঁর নামেই নাম। এরপর হেঙ্কেলসায়েবের গঞ্জ, হিঙ্গলগঞ্জ। ১৭৮১ সালে যশোহরের জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন টিলম্যান হেঙ্কেল। তিনিই সুন্দরবনের বাদাবন কেটে এই এলাকার পত্তন করেন। জল-জঙ্গল সরিয়ে বেরোয় উর্বর কৃষিজমি। হেঙ্কেল সাহেব ইছামতীর ধারে প্রতিষ্ঠা করেন 'হেঙ্কেলগঞ্জ বাজার'। সেই 'হেঙ্কেলগঞ্জ'ই ধীরে ধীরে 'হিঙ্গলগঞ্জ' হয়ে যায়। মুগ্ধ হয়ে তিনজন শুনছিল বিশ্বনাথ গায়েনের কথা। আকাশ নির্মল। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। তারা সুন্দরবনের দূর গভীরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। এই যে এই পৃথিবী, একে তারা ভুলেই গিয়েছিল প্রায়।

এগারো

ট্রেকার থেমেছে। লেবুখালি ঘাট। এখান থেকে ভুটভুটি নৌকোয় চেপে সুন্দরবনের অন্তঃস্থলে যেতে হয়। তারা যাবে। লেবুখালি ঘাটে নৌকো প্যাসেঞ্জার হাঁকছে, ভাণ্ডারখালি, দুলদুলি...। লেবুখালিতে কালিন্দী আর গৌড়েশ্বর মিশেছে রায়মঙ্গল নদীর সঙ্গে। রায়মঙ্গল নদীর গায়ে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা হবে। কালিগঞ্জেই ইছামতী থেকে রায়মঙ্গলের জন্ম। ইছামতী আরও নদীর জন্ম দিয়েছে এদিকে। বিদ্যাধরী, ঝিলা, কালিন্দী এবং যমুনা নদী। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম দিকে বসন্তপুরে ইছামতী থেকে জন্ম নেওয়া যমুনা থেকে কালিন্দীর জন্ম। রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় এই শাখা সাধারণ খালের মতো ছিল। পরে প্লাবনে কালিন্দী বড় নদীতে পরিণত হয়। বড় গাঙ। দেখলে ভয় করে। অন্তহীন জল আর জল। বিশ্বনাথ গায়েনের সব জানা। সুন্দরবনের মানুষ আর মাটির ইতিহাস লিখছে বিশ্বনাথ। এখন তারা ভুটভুটি চালিত বড় নৌকোয় বড় গাঙে ভেসেছে। গঞ্জের মানুষ তাদের সাথী। তারা কতরকম কথা বলছে। ধানের কথা, জমির কথা, বাঘের কথা, কলকাতার কথা। নন্দীগ্রামের কথাও তাদের জানা। কে যেন তুলল। আর একজন থামিয়ে দিল। কে কী বুঝবে কে জানে। সময় ভালো না। নৌকো এসে যে ঘাটে ভিড়ল, সেই ঘাট ভান্ডারখালি। ভান্ডারখালিতে কিছু লোক নামে, কিছু ওঠে। তারা যাবে দুলদুলি। দুলদুলিতেই জলযাত্রা শেষ। এরপর দিকহারা গাঙ দক্ষিণে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। দুলদুলিতে নেমে মেয়ের মুখ যেন আলোয় ঝলমল করতে লাগল। বলল, এবার আবার ট্রেকার, মথুরগঞ্জ, এইটা আমি জানি।

এই দ্বীপ শেষ দ্বীপ যেখানে মানুষ বসত করে। বিশ্বনাথ গায়েন বলে, ১৫ কিলোমিটার মথুরগঞ্জ, তারপর আরও যদি যাওয়া যায় কালিতলা, তারপর সামসেরগঞ্জ। সামসেরগঞ্জের পরেই জঙ্গল আরম্ভ হয়ে গেল। ঝিঙেখালির গাঙের পর বাঘের দেশ। গাঙটা খুব ছোট। বাঘ এসে পড়ে জঙ্গলের জাল টপকে। বনের পশুর খাদ্যের অভাব হলে চলে আসে মানুষের বসতিতে।

হ্যাঁ মা, বাঘে তো গরু-ছাগল নিতি ঢুকে পড়ে মাঝেমধ্যে, আমাদের বাঘের দেশ। বলল বহ্নিলতা।

শুনতে শুনতে বহ্নিশিখা ভাবছিল, সে এই দেশটার কিছুই জানে না। কতদূরে মানুষ বসবাস করে। তাদের শহর নেই, আলোর ঝলকানি নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, শুধু গাঙ পারাপার আছে। কত কত বড় এই দেশ! নাকি এসব দেশের ভিতরে থেকেও আলাদা। মথুরগঞ্জে নেমে এগোতে যাবে চারজন, তো একটি বছর ষোলো-সতেরোর যুবক এসে দাঁড়াল বহ্নিলতার সামনে, লতু এলি, কত বড় হয়ে গিলি তুই।

রবিদা, তুমি কত লম্বা হই গেছ, মা, এ হলো রবিদা, রবিদার বুন মৌমিতা আমার সঙ্গে পড়ত, বিয়ে হয়ে গেছে শুনিচি, ইস্কুল আবার চালু হয়েছে রবিদা?

রবি ঈষৎ বক্র স্বরে বলল, বন্ধ হয়ে থাকবে নাকি, গ্রামে কি লেখাপড়া হয় না, তার জন্যি কলকাতা যেতি হয়?

সুশান্ত দেখল ময়লা ময়লা রঙের ছেলেটির চোখ ঘুরছে সকলের উপর। সে এবার সুশান্তকে বলল, আপনারা এয়েচেন, একবার পার্টি অফিস হয়ে যাবেন।

কেন গো রবিদা? বহ্নিলতা জিজ্ঞেস করে।

আমার কাকা ডাকতেছেন, উনি পঞ্চাত সমিতির সভাপতি, কাকা আমারে পাঠাল।

এখন যেতে হবে? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে।

কাজ মিটায়ে যান, ফেরবেন তো আজই?

হ্যাঁ, ফিরব। বলল বিশ্বনাথ গায়েন।

নামটা মনে আছে সুশান্তর। পরিতোষ মণ্ডল। সে লতা আর বহ্নিশিখাকে যেতে বলল, কাছেই তো বাড়ি। বিশ্বনাথকে নিয়ে পার্টি অফিসে গেল। আগেরবার ২০০ টাকা নিয়েছিল, এবার কত নেয় কে জানে? এখানে একটা ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কের বেলঘরিয়া শাখায় সুশান্তর অ্যাকাউন্ট। প্রয়োজনে চেক দিয়ে যাবে সে। রবি আগে আগে হাঁটতে লাগল। বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করল, রবি তুমি কী করো?

ইলেবেনে পড়ি হাই ইস্কুলে। রবি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কেন?

সায়েন্স না আর্টস?

রবি বলল, আর্টস, কেন?

বিশ্বনাথ বলল, এমনি, আচ্ছা তুমিও পার্টি করো?

ইয়েস, রুলিং পার্টি আমাদের, লাল পার্টি, কেন? রবির চোখে সন্দেহ, বলল, আপনি তো নক্সাল ছিলেন শুনিছি।

বিশ্বনাথ বলল, হ্যাঁ ছিলাম, আমি এমনি জিজ্ঞেস করছি, রবি তুমি কলকাতায় গেছ?

কতবার গিইছি, পার্টির পোগগাম হলেই যাই, কেন?

প্রতি উত্তরের সঙ্গে একটি জিজ্ঞাসা, একটি শব্দ 'কেন'? রবির চোখে খুব সন্দেহ। তার 'কেন'র জবাব দেয় না বিশ্বনাথ। তারা পার্টি অফিসে এসে গেছে। বড় দোতলা পাকা বিল্ডিং। আগেরবার একতলা দেখেছিল তারা। দোতলায় উঠে গেল তারা। দোতলায় যে ঘরে তাদের

নিয়ে গেল রবি, সেই ঘরের জানালা থেকে মথুরগঞ্জের ট্রেকার স্ট্যান্ড, রাস্তা ভালো দেখা যায়। কে এল, কে গেল, কে এল না, কে গেল না ধরা যায়। পরিতোষ মণ্ডল বছর পঞ্চাশ হবেন। মোটা গোঁফ, কালো কুচকুচে। মাথার চুল কাঁচায় পাকায়। মুখখানি গোলাকার। চোখদুটি বড়, পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি সব কিছু দেখতে পছন্দ করেন। অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে তা সমুখের মানুষের কাছে। গোলাকার মেদবহুল দেহ। মাথায় পাখা ঘুরছিল। মথুরগঞ্জে জেনারেটর চালিয়ে সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি আলো জ্বালান হয়। আর পার্টি অফিসের নিজস্ব জেনারেটর আছে। তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সুশান্ত, বিশ্বনাথ। ওরা বসল সভাপতির টেবিলের সামনের দুই চেয়ারে। তিনি বললেন, আপনাদের না ডাকা করলে তো আসতেননি, বসেন, মেয়েডা কই?

বাড়ি গেল। বিশ্বনাথ জবাব দেয়।

পুজোর ছুটিতে এল? পরিতোষ মণ্ডল জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ, আপনি ভালো আছেন? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে।

তিনি চুপ। কী যেন ভাবছিলেন। মনে করতে পারছিলেন না। নাকি কী ভাবে বলবেন তা ঠিক করে নিচ্ছিলেন, তারপর গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, মেয়েডারে নিয়েই নিলেন?

নিয়ে নিইনি তো, লেখাপড়া শেখাচ্ছি। বলল সুশান্ত।

গাঁয়ে শিখত লেখাপড়া, আপনারা না হয় খর্চা দেতেন। বললেন পরিতোষ। চুপ করে থাকলেন কিছু সময়, তারপর বললেন, আসলে আমাদের নজরে থাকত তো, এক জা'গার গাছ অন্য জা'গায় পুতলি কি ভালো হয়, না বাঁচে।

সুশান্ত সতর্ক হলো, লতাকে কি আটকে দেবে, পুজোর পর নিয়ে যেতে দেবে না, সে খুব বিনীত সুরে বলল, আপনি আসুন না আমার বাড়ি, বেলঘরিয়ায়, কলকাতায় গেলে প্লিজ আসুন।

ঠিকানা রেখে যান, আচ্ছা কলকাতার কী অবস্থা?

ভালোই তো। বলল বিশ্বনাথ।

পরিতোষ মণ্ডল ভোল বদল করে বললেন, আপনারা অবিশ্যি ভালোই করেছেন, মেয়েটা ভালো ইস্কুলে পড়ছে, আমাদের এখেনে সব সুবিধে নেই, কিন্তু সবাইরে তো নে যেতি পারবেন না, কেউ পাবে কেউ পাবে না সুযোগ, আমাদের সরকার চায় সার্বিক উন্নতি, সকলের, পঞ্চায়েত তাই করছে, একডারে তুলে নে গে পালন করা কলকাতার মানুষের খেয়াল-খুশি, তা আমরা হতি দেব না আর।

সুশান্ত, বিশ্বনাথ চুপ করে থাকে। সমস্ত জীবন যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা, মিছিল, আত্মগোপন, জেলখানা, মিছিল করে আসা সুশান্ত উদ্বিগ্ন হলো। তার কেন যে গা ছমছম করে উঠল। সতর্ক হতে বলছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

দুপুরে ভাত খাবেন কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন পরিতোষ।

সে হবেখন। বিশ্বনাথ গায়েন বলল।

না না, আমার বাড়ি গে বসেন, ওখেনেই খাবেন, আপনারা অতিথি বটে। পরিতোষ মণ্ডলের মেজাজ আচমকা বদল হয়ে গেল। তিনি বললেন, রবি ওঁদের নে যা, আমাদের ওখেনে খাবেন ওঁরা।

সুশান্ত বলল, ধন্যবাদ, কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা লতার বাড়ি যাই আগে।

দরকার নেই, আগেরবার তো গিইছিলেন, ওদের খবর দিচ্ছি, সব আমার বাড়িতি এসে দেখা করবে, মেয়েডারে নেছেন বলে ওই রিফিউজি বাড়িতি খেতি হবে নাকি, ওদের নিজেদেরই হাড়ি চাপে না পেত্যেক দিন, আমারেই দেখতি হয়।

সুশান্ত বলল, না, আসলে...। কথা থামিয়ে দেয় সুশান্ত। লোকটা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটি ঈষৎ লাল হয়ে উঠে জ্বলছে। পরিতোষ মণ্ডল ঘাড় ঘুরিয়ে ভাইপোকে বললেন, আর যিনি আছেন ম্যাডাম, তাঁরে নে আসবি রবি।

আহা, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা দুপুরের রুটি, তরকারি, মিষ্টি, ফল সঙ্গে নিয়েই এসেছি, অবেলায় পৌঁছলে অসুবিধে হবে বলে। মিথ্যে করেই বলল বিশ্বনাথ। কিন্তু সুবিধে হলো না। এই দ্বীপে পরিতোষ মণ্ডলের কথা আদেশই। তা কেউ অমান্য করার কথা ভাবতেই পারে না। চোখ দুটি যেন দপদপ করছে। পরিতোষ মণ্ডল লোক পাঠিয়ে বাড়িতে খবর দিয়েছেন এর ভিতরেই। তিনি বললেন, ওই লতুর মা আমার বাড়িতেই দাসী, রবি তুই কাউরে দিয়ে খপর দে, লতুর মা পুষ্প যেন চলে আসে, মুছামুছি, থালা-বাসন ধুয়াধুয়ি আছে, আর লতুরেও বলিস খেতি আসতে।

কী অদ্ভুত হয়ে গেল। কিছু করার উপায় থাকল না। পরিতোষ মণ্ডলের কথা এই দ্বীপভূমিতে চূড়ান্ত। তাঁকে অমান্য করবে কে? আপত্তি করতে পারে না সুশান্ত, তার ভয় হচ্ছিল যদি লতাকে আটকে দেয় পুজোর পর। পরিতোষের একটিই কথা, তাঁর বাড়িতে খেয়ে রওনা হবেন অতিথিরা। যাওয়ার সময় লতুর বাড়ি না হয় ঘুরে যাবেন। মথুরগঞ্জে বিশিষ্ট কেউ এলে, তাঁর বাড়িতেই অন্ন গ্রহণ করেন। সবাই তা জানে। লতুর বাপ-মাও জানে। বলেনি কেন লতু?

তাইই হলো। ভ্যান রিকশায় চেপে তারা চলল পরিতোষ মণ্ডলের বাড়ি। বাড়ি তো নয়, দুর্গ। মাটির প্রাচীরে ঘেরা। প্রবেশ পথে ইট গাঁথনির দুই পিলারে লাগানো বেশ জাব্দা শালকাঠের দরজা। একটু নিচু হয়ে ঢুকতে হয়। মোটর সাইকেলে আগেই এসে গেছেন পরিতোষ। স্বাগত জানালেন। বললেন, বাংলাদেশি ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেতে এই ব্যবস্থা। বিশ্বনাথ এবং সুশান্ত প্রবেশ করল মাথা নামিয়ে। ভিতরে অতি প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের এক ধারে ধান সেদ্ধ হচ্ছে। পরপর তিনটি উঁচু পোতার ভিটা। ইটের গাথনির একটা, ঢালাই ছাদ। শীর্ণকায় কামিন একজন বসে আছে সেখানে। চুলোয় আগুন লকলক করেছে। কাঠই জ্বালানি। একজন কুড়োলে চেরাই করছে মস্ত এক কাঁঠালের গুড়ি। চেরাই কাঠ উঠনে স্তূপ হচ্ছে। আবার রৌদ্রে শুকোচ্ছে বিছিয়ে দেওয়া কাঠও। পরিতোষ হাকডাক আরম্ভ করল, অতিথ এসে গেছে, কলকাতার অতিথ। এই গুলু, হাতমুখ ধুবার জল নে আয়।

বালতিভরা জল এলো। একটি ভৃত্য নিয়ে এল। তারা মুখ ধুয়ে পাকা বাড়ির বারান্দায় চেয়ারে বসে। চিনি কাগজি লেবুর শরবত এল। কে যেন দরজা দিয়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল, ভৃত্য তা নিয়ে এলো। তারা দেখতে লাগল ধান সেদ্ধ, কাঠ চেরাই, কাঠ শুকানো আর ত্রাস্ত দাস-দাসীদের চলাফেরা। সুশান্ত ফোন পায় বহ্নিশিখার, এ কী ব্যাপার, তোমরা কোথায় বসে আছ?

পরে কথা হবে, এস এখানে। সুশান্ত চাপা গলায় বলল।

কেন, তোমরা এখেনে আসবে না?

সুশান্ত বলল, পরে বলব, আগে এস। ফোন কেটে দিল সে।

একটু পরে ক্রুদ্ধ বহ্নিশিখা ঢুকল। সে একা। ঢুকতে ঢুকতে বলল, ওরা ডাল ভাত চাপিয়েছিল।

পরিতোষ মণ্ডল বলল, সে ওরা খেয়ে নেবে ম্যাডাম, আপনি আমাদের মথুরগঞ্জ আইল্যান্ডে গেস্ট, আর এখেনে যাঁরা আসেন, আমার ঘরে অন্ন গ্রহণ করতেই হয়, জ্যোতি বসু পর্যন্ত এয়েছেন এখেনে।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে লতা কই?

হেঁটে আসছে ওর মাকে নিয়ে, এইটা কি ঠিক হলো?

ঠিকই হয়েছে ম্যাডাম। পরিতোষ মণ্ডল তার কথার পিঠে কথা বলল। বহ্নিশিখা আচমকা চুপ করে যায়। এতক্ষণে সে হয়তো উপলব্ধি করছিল বাস্তব। পরিতোষ মণ্ডল অন্তঃপুরে গেল। এ বাড়ির মেয়েদের দেখা যাচ্ছে না। একবার মাথাভর্তি ঘোমটা কে বাইরে এসে ভিতরে ঢুকে গেল। সুশান্ত বহ্নিশিখাকে বলল, লতা কি আজ যাবে আমাদের সঙ্গে?

কেন, ও তো বিজয়ার পর যাবে, এখেনে দশমীর মেলা বসে। বহ্নিশিখা বলল।

মা বাবাকে তো দেখে গেল! সুশান্ত বলে।

কী হয়েছে? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

তখন বিশ্বনাথ গায়েন নিম্নস্বরে বলল, তুমি যা ভাবছ তা হবে না সুশান্ত, গরম দেখান এদের অভ্যেস, দশমীর পরের দিন এসে নিয়ে যাব, এখন এদের পার্টি নানা ব্যাপারে জর্জরিত, ফালতু ঝামেলা পাকাবে না।

সুশান্ত বলল, লোকটাকে আমার সুন্দরবনের বাঘ মনে হচ্ছিল।

বাঘে বিনি কারণে হুঙ্কার দেয় না, থাবাও তোলে না। চাপা গলায় বলল বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ গায়েন বলল, পার্টি বিপদে আছে, এখেনে পাল্টা পার্টিও মাথা তুলছে, তোমার চিন্তা নেই।

তখন লতা আর তার মা পুষ্পরানি ঢুকল ভিতরে। পুষ্পরানির মাথা ঢাকা অনেকটা ঘোমটায়। সে দ্রুত পায়ে ভিতরে ঢুকে গেল একটি কথাও

না বলে। লতাও মায়ের পিছু পিছু গেল, বলল, জেঠির সঙ্গে দেখা করে আসি।

বারো

লতা কলকাতায় ফিরে বলল, হ্যাঁ, উনি অমন, ওঁর কথাই মথুরগঞ্জে শেষ কথা। তারা যদি সেদিন না খেয়ে চলে আসত, বিপদ হতো, রাগ পড়ত রিফিউজির ওপর, উনি তার বাবাকে রিফিউজির ছাওয়াল বলে ডাকেন, ঠাকুদ্দাকে রিফিউজি বুড়ো, খাওয়া হয়েছে ভালো হয়েছে।

তারা ফেরার সময় লতাদের বাড়ি হয়ে এসেছিল। দুই পুরুষ বসেছিল, একজন হাতনেতে আর একজন উঠনে নিম গাছের গোড়ায় ছোট চৌকিতে। বুড়ি ঠাকমা যমুনা হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকাশে। বুড়ো রিফিউজি নিতাইহরি জাল বুনছিল নিজ মনে। তারা সকলেই অপেক্ষা করছিল মেয়ে আর তার মায়ের জন্য। মেয়ের মা আসেনি। বাসন মেজে সব পরিষ্কার করে ফিরবে। বলাইহরি উঠে এসে বলেছিল, আর একবার এস মা, ভাত খেয়ে যেও।

হ্যাঁ, আসব, তোমরা যেও কলকাতায়। বহ্নিশিখা বলল।

আশি পার করা রিফিউজি বুড়ো নিতাইহরি বলেছিল, আমি পারব না, মনে হয় এখেন থেকে বেরুলিই যেন সেই বিরামপুরা রিফিউজি ক্যাম্পে ফিরি যেতি হবে, ওই মণ্ডলের পো আর ঢুকতি দেবে না।

মণ্ডল তাই বলেছে? সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল।

বুড়ো মাথা নেড়েছিল, না, বলে নাই, কিন্তু মনে সেই ভয় হয়, এখনো দুঃস্বপ্ন দেখি।

কিসের দুঃস্বপ্ন? সুশান্ত তার সম্মুখে হাঁটু মুড়ে বসেছিল।

মরিচঝাঁপিতি পুলিশের মার। বলে বুড়ো মাথা নিচু করে, বিড়বিড় করে, আবার সেই মরুভূমি, নরক, জল নাই, বিষ্টি নাই, আমি এই ভিটে ছেড়ে যাবনি।

কলকাতা থেকে ফিরে আসবেন তো আবার। বলেছিল সুশান্ত।

ফিরে এসে দেখব ভিটা নাই। বুড়ো বলেছিল, এই রকম হয়, হয়েছে কতবার।

বুড়ি বলে, মেয়েডা ভালো থাকুক, ভগমান তুমাদের ভালো করুক।

বলাইহরি এগিয়ে এসে বলেছিল, বাবা না গেলি তো লতুর মা যেতি পারবেনি, আমি যাব মেয়েরে নিয়ে।

বুড়ি বলেছিল, তোর আবার বেশি বেশি, আমি কি রান্না করে খাওয়াতি পারব না?

তুমি চলতি ফিরতি পার না, কী ঘটাই বসবা মা, কী করে তুমাদের রেখে যাব?

বুড়ি বলে, আমি আর তোর বাপ না হয় চিড়ামুড়ি খেয়ে ক'দিন কাটাই দেব, উনুনে আগুন দেব না।

তা হয় নাকি মা! বলাইহরি বলে, ভাত ছাড়া বাবা থাকতি পারে না।

খুব পারবে, এক কাঁদি সবরি কলা আর চিড়া গুড়, এতিই হবে। বুড়ি বলে, গুনগুন করে,

চিড়া গুড় সবরি কলা
তাই দি যায় তিন বেলা।
লেবু পাতা লেবু পাতা
আর চাইনে মাছের মাথা।

নাতনি বহ্নিলতা বলেছিল, ওই তুমি আরম্ভ করলে,
ভাত খাবা না চিড়া মুড়ি
তুমি একটা আচ্ছা বুড়ি।
বুড়ি আমার ঠাম্মা বুড়ি
দেয় দেখ দেখি বুড়বুড়ি।
যেমন দেয় মাছের দলে
সাত মানুষের গহিন জলে।

বহ্নিশিখা কেন তারা সবাই অবাক, আরে তুই দেখি ছড়া বলিস।
বুড়ি ঠাকমা বলেছিল, নাতিনি আমার এমনি এমনি,
ডয়রা কলা সেদ্ধ
আমরা দুই বেদ্ধ
মরব কবে ঠিক নাই
যুগীপোতার ঠিকানাই।

লতার মা ফিরে এসেছিল। তার মন খুব খারাপ। ভাত খাওয়াতে পারেনি। দেখা করতে এসেছে, আবার বাবুর বাড়ি যেতে হবে, বাসনের পাঁজা, উঠন ঝেটাতে হবে, কাজ শেষ হয়নি।

তারা আর দাঁড়ায়নি। একছড়া সবরি কলা দিয়েছিল লতার মা পুষ্প। আর কী দেবে? আছে কী?

বহ্নিশিখা বলেছিল, লক্ষ্মীপুজোর পরই চলে আসতে।

বলাইহরি বলেছিল, সে দিয়ে আসবে।

কিন্তু লতাকে নিয়ে এসেছিল বিশ্বনাথ গায়েন। বলাই আসেনি। না, আনতে কোনো অসুবিধে হয়নি। আর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরিতোষ মণ্ডল তখন ছিলেন না মথুরগঞ্জ দ্বীপে। ছোট মোল্লাখালি গিয়েছিলেন কুটুমবাড়িতে। নিশ্চিন্তে আনতে পেরেছিল বিশ্বনাথ। লোকটা তার দাপট দেখাতে হয়তো বলতে পারত আর ক'দিন বাদে নিয়ে যেতে। লোকটা অন্যদের বিব্রত করতে ভালোবাসে। মথুরগঞ্জের শাসক সে, তা প্রতিপদে প্রমাণ করতে চায়। ক্ষমতা প্রকাশের প্রধান লক্ষণ হলো দুর্বলকে বিব্রত করা। অহেতু হেনস্তা করা।

লতা এসেছিল লক্ষ্মীপুজোর পর। তখন শহর মফস্বল ছিল শান্ত। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে চাপানউতোর চলছিল। তর্ক বিতর্ক চলছিল। গুটিগুটি হেমন্ত এলো শহরে। হিম হিম ভাব আসে রাতের দিকে। মেয়ে তার মা বহ্নিশিখার সঙ্গে গল্প করে কত। সুশান্ত থাকে শ্রোতা। মেয়ে বলে, তাদের মথুরগঞ্জে খেজুর গাছ কাটা শুরু হলো। তার বাবা বলাইহরি গাছ জমা নেয়, সভাপতির গাছ ফ্রিতে করতে হয়।

হুঁ। বহ্নিশিখা বিড়বিড় করে, কিছুই বদলায়নি দেশটার, আমরা ঘর ছেড়েছিলাম কেন, কেন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলাম, জেল খেটেছিলামই-বা কেন?

মেয়ে বলে, খেজুর পাটালি খুব ভালো হয় মথুরগঞ্জে, মা এখন ধান পেকেছে, এই সময়টা খুব ভালো।

মেয়ে বলে, বাবা বলেছে এবার ঝড়-বাদল হয়নি তেমন, ধান ভালো হয়েছে।

মেয়ে বলে, এ সময় লোকের ঘরে অভাব থাকেনি, পিঠে পুলি হয়, মা ঠাকমা করে কত রাত জেগে, রসের পিঠে, দুধ থাকে না, কিন্তু তার স্বোয়াদ কত।

মেয়ে গুনগুন করে তাদের সংসারের কথা বলে। ছয় ঋতুর কথা বলে। ছয় ঋতুতে কেমন থাকে তারা সেই কথা শোনায়। বারমাস্যা।

বৈশেখে ভীষণ কষ্ট
চাল বাড়ন্ত হয়
বর্ষায় ধান রোয়া
ভীষণ সাপের ভয়।
ফুটা চালে জল পড়ে
গাঙে তুফান হয়
বড় গাঙ উঠে আসে
জমি নুনা হয়।
শরতে ঝড় বাদলা
ফুরায় ধীরে ধীরে
কালো মেঘ তিতা মেঘ
যাও ঘরে ফিরে।

শুনতে শুনতে বহ্নিশিখা জড়িয়ে ধরে মেয়েকে, কে বলেরে এমন বারমাস্যা?
বহ্নিলতা বলে, বোধ হয় আমার ঠাকমা যমুনাবুড়ি বলে।
যমুনাবুড়ি আর কী বলে?

• চলবে...

চলচ্চিত্র

বুদ্ধদেবের সিনেমায় ম্যাজিক

মাহমুদুর রহমান

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমায় ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ যে ধারা শুরু করেছিলেন, একই সময়ে মৃণাল সেন সেই ধারায় সিনেমাকে আরও এগিয়ে নিয়েছিলেন। এ ত্রয়ীর পর সমকক্ষ কাওকে সত্যিকার অর্থে ধরা যায় না। তুলনা করা উচিত কিংবা প্রয়োজন কিনা সে অন্য তর্ক, তবে তুলনা এসেই যায়। তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, গৌতম ঘোষ প্রমুখের সিনেমা বিনোদন ও শিল্পকে ধারণ করে কিন্তু তুলনামূলক স্বল্প আলোচিত। সত্যজিৎ, মৃণাল ও ঋত্বিক যতটা আলোচিত, এ সময়ে এসে তরুণ কিংবা তপন সে আলোচনায় নেই। অন্যদিকে ঋতুপর্ণ, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেনরা আলোচিত, তবে অনেক পরে সিনেমা তৈরি করেছেন তারা। এদিক দিয়ে অনেকটা নীরবে, নিভৃতে সিনেমা তৈরি করে গেছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পুরুলিয়ার বৈদ্য পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দূরত্ব' নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন। সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য'র পর প্রদীপ মুখার্জিকে এই সিনেমায় আবার পাওয়া যায়। এর মধ্যবর্তী সময়টা প্রদীপ নিভে ছিলেন বললে ভুল হয় না। বুদ্ধদেবের সিনেমা দিয়েই ফেরেন তিনি

দূরত্বে প্রদীপের বিপরীতে ছিলেন মমতা শঙ্কর। ভাঙনকালে দুটি মানুষের টানাপড়েন উপজীব্য করে নির্মিত এ সিনেমার গল্পটি বুদ্ধদেবের নিজের। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি থেকে আরম্ভ করে মানুষের সম্পর্কের জটিলটার মধ্যদিয়ে কলকাতার তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় সিনেমায়। সময় ও পরিস্থিতি বুদ্ধদেবকে ভাবিত করেছিল। এর সরাসরি প্রভাব দেখা যায় তিন বছর পরে, ১৯৮২ সালে মুক্তি পাওয়া 'গৃহযুদ্ধ' সিনেমায়। মমতা শঙ্কর ও অঞ্জন দত্তের সঙ্গে এ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন গৌতম ঘোষ। লেবার ইউনিয়ন, বিপ্লব কী করে পুঁজিবাদ ধীরে ধীরে গ্রাস করে নেয়, অঞ্জনের বিজন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। আর মমতা শঙ্কর শেষ অবধি টিকে থাকেন আদর্শের প্রতিভূ হয়ে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ক্যারিয়ারের প্রথম পর্যায়ের সিনেমাগুলোতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ পাওয়া যায় বেশি। এর মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছিল সত্তরের দশকের আদর্শিক রাজনীতির প্রতি মানুষের টান ও পরে মোহভঙ্গের গল্প। গৃহযুদ্ধে এ বিষয় আন্তর্জাতিক বা সামাজিক পর্যায় থেকে এসে পড়ে পরিবারে। সেখানে তৈরি হয় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দূরত্ব। আমাদের বর্তমান সমাজে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তার কারণ অনেকাংশে রাজনৈতিক আর সে খবর আমাদের বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত অনেক আগেই দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মজার ব্যাপার, তার সিনেমা অনেক ক্ষেত্রেই এক্সপেরিমেন্টাল। তিনি ঐ সময়ে অনেক পরিচালক, সম্ভাব্য পরিচালককে অভিনয় করিয়েছিলেন। যেমন, গৌতম ঘোষ। এমনকি তার সিনেমায় অভিনেতা হিসেবে আমরা পাই মহেশ ভাটকে এবং সে সিনেমাতেও বিপ্লব-প্রসঙ্গ ছিল। মহেশ ভাট, দিপ্তি নাভাল, অনিল চ্যাটার্জিকে নিয়ে তৈরি 'অন্ধ গলি'তেও বিপ্লব ইত্যাদি প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু কমিউজমের এসব কথা এরপর এত স্পষ্ট করে কোথাও বলেননি বুদ্ধদেব। তার পরবর্তী সিনেমাগুলো স্বপ্ন আর ম্যাজিকে ভরপুর।

শুধু ম্যাজিক বললাম কেননা একে পুরোপুরি 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' বলা যায় না। আবার জাদু যে ছিল, তাও স্পষ্ট কেননা বুদ্ধদেব নিজেই বলেছেন তিনি খানিকটা বাস্তব, খানিকটা স্বপ্ন আর খানিকটা ম্যাজিক দিয়ে সিনেমা তৈরি করেন। ওভাবেই তিনি সিনেমার গল্পটা বলতে পছন্দ করেন। এর পাশাপাশি হয়তো রাজনৈতিক বক্তব্য সিনেমায় রাখতে রাখতে এক সময় বুঝেছিলেন ওতে খুব একটা লাভ হবে না। তাই গল্প বলার ধরণ বদলালেন। চেষ্টা করলেন সিনেমায় ঘোর লাগাতে। সমিত ভঞ্জ, কামু মুখার্জি, বিপ্লব চ্যাটার্জিদের নিয়ে তৈরি 'ফেরা' (১৯৮৮) তেমনই এক ঘোরলাগা সিনেমা। হেরে যাওয়া কিংবা ফুরিয়ে যাওয়া এক লেখকের ফেরার চেষ্টার গল্প।

সিনেমাটির শুরু থেকেই একটা নীরবতা যেন অনেক কথা বলতে শুরু করে। বুদ্ধদেব এ সিনেমায় ফ্রেমের ব্যবহারে গল্প বলার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, সরাসরি কোনো সংলাপ বা ঘটনার মধ্যে না, গল্প থাকবে অন্য অনুষঙ্গের মধ্যে। কিন্তু এর মধ্যেও বুদ্ধদেব বাস্তব থেকে সরে যাননি। বাস্তবতা আর বাস্তবতার কষাঘাত সব সময়েই তার মাথায় ছিল। 'ফেরা'র পরের বছর (১৯৮৯) তৈরি করা 'বাঘ বাহাদুর' বড় বাস্তব। বহুরূপীর পেশা আজ আর নেই কিন্তু এক কালে তারা ছিল গাঁওগেরামে জনপ্রিয়। তেমনই এক লোক ঘুনুরাম। বাঘ সেজে মনোরঞ্জন করত লোকের। বাঘের মুখোশ পরে, গায়ে রং মেখে খেলা দেখাত সে। কিন্তু একদিন শহর থেকে আসে সত্যিকার বাঘ। সার্কাসের সামনে চাহিদা হারায় ঘুনুরাম। মুখ থুবড়ে পড়ে সে। নিজেকে টিকিয়ে রাখতে সেই বাঘের সঙ্গেই লড়তে যায়। এ গল্পে ম্যাজিকের প্রয়োজন হয় না।

সাহিত্য থেকে সিনেমা নির্মাণ করতে পছন্দ করতেন বুদ্ধদেব। এমন অনেক গল্প তিনি বেছে নিয়েছেন যা থেকে সিনেমা নির্মাণের কথা অনেকে ভাবেননি। কমলকুমার মজুমদারের গল্প 'তাহাদের কথা'কে সিনেমায় এনেছেন বুদ্ধদেব। বিপ্লবের গল্প তিনি ছাড়তে পারেননি। তবে এরপর যেসব বিপ্লবের গল্প বলেছেন তা ব্যর্থ। সত্তর-আশির দশকের কমিউনিস্ট মুভমেন্টের গল্পের পাশাপাশি এই গল্পটা মূলত একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর। যাকে ব্রিটিশ সরকার দ্বীপান্তর করেছিল। পুলিশি অত্যাচারে যার শারীরিক, মানসিক সক্ষমতা শূন্যের কাছাকাছি। এ সিনেমার সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবনাথ। তার চরিত্রে অভিনয় করছেন মিঠুন চক্রবর্তী। আর তার বন্ধুর চরিত্রে দীপঙ্কর দে ভারতের রাজনীতির আদর্শবাদী আর বাস্তববাদীর চিত্র তুলে ধরেছেন। এই সিনেমার বক্তব্যে কোনো ম্যাজিক নেই, বরং শেষ রয়েছে। পুলিশের রুলের গুঁতো খেয়ে মলদ্বার শিথিল হয়ে শিবনাথের যখন তখন বাহ্যের বেগ পাওয়া, 'স্বাধীনতা কেমন?' প্রশ্নের জবাবে সশব্দ বাতকর্ম, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটকে 'ঢ্যামনা' বলা সেই শেষের পরিচয়।

কিছু দৃশ্যে এ সিনেমায়ও আছে ম্যাজিক। যেমন লেস ফিতাওয়ালার আয়নায় দিগন্তের প্রতিফলন, কুয়াশার মধ্য দিয়ে শিবনাথের ছেলের দৌড়ে যাওয়া, প্রায় পরিত্যক্ত এক বাড়ির বড় বড় জানালা দরজার মধ্যদিয়ে শিবনাথ-হেমাঙ্গিনীকে দেখানো; একেকটি ফ্রেমে ম্যাজিক রেখেছেন বুদ্ধদেব। রহস্যও আছে সেখানে। তবে সবচেয়ে বেশি ম্যাজিক সম্ভবত ছিল 'লাল দরজা' (১৯৯৭), 'কালপুরুষ' (২০০৫), 'আনোয়ার কী আজব কিসসা' (২০১৩) সিনেমায়। এর মধ্যে 'লাল দরজা' সবচেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক এবং জাদুবাস্তবতার কাছাকাছি ধারার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনকি দুর্বোধ্য। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, চম্পা, রাইসুল ইসলাম আসাদ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত এই সিনেমায় এক মধ্যবয়সী পুরুষের দাম্পত্য ও মানসিক টানাপড়েনকে ম্যাজিকের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব একটা সময় এই ম্যাজিকের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। কালপুরুষেও সেই ম্যাজিক আমরা দেখি। ম্যাজিকের পাশে এখানে ছিল সম্পর্কের নানা রহস্য, দূরত্ব, দুর্বোধ্যতা। শেষ পর্যন্তও ছিল তা। বহুদিন ঝুলে থাকার পর মুক্তি পেয়েছিল আনোয়ার কা আজাব কিসসা। সিনেমায় আনোয়ারের গোয়েন্দা চরিত্র কেবলই একটা অনুষঙ্গ, এই সিনেমার মূলে ছিল তার মনোজগতের জাদু। সিনেমার শেষের দিকে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর সঙ্গে পঙ্কজ ত্রিপাঠীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিষয়গুলো বোঝা যায়।

গল্পও বলার ধরণ, সিনেম্যাটগ্রাফির অনেক ক্ষেত্রে খামখেয়ালিপনা, ক্ষেত্র বিশেষে ভুলও রয়েছে তার প্রতিটি সিনেমায়। ক্ষেত্র বিশেষে কারিগরি ত্রুটি দেখা যায়। এর কারণ সম্ভবত বাজেট ও পরবর্তী সময়ে সংরক্ষণে যত্নের অভাব। সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে কাটাছেঁড়া হয়ে আসা সিনেমা দেখতে খানিক বিরক্তিই আসে। তবে সেটা নিশ্চয়ই শুরুতে ছিল না। অন্যদিকে বলতে হয় বুদ্ধদেবের চিত্রগ্রহণ চমৎকার। অবশ্য সেকথা আগেই বলা হয়েছে। গ্রামীণ পথঘাট, পাহাড় জঙ্গল, নদী থেকে একটা সিঁড়ি (লাল দরজা) দেখানোর মধ্যেও আর্ট ছিল। দুর্গম রাস্তায় একটা গাড়ি চলার মধ্যে (মন্দ মেয়ের উপাখ্যান) একটা উপমা ছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের অবহেলা না ভারতীয় সিনেমার অবহেলা, সেসব যত্ন করে রাখা হয়নি। 'চরাচর' একটা অসাধারণ সিনেমা এবং অসাধারণ গল্প। সিনেমার শেষ দৃশ্যটা সারা জীবন চোখে লেগে থাকার মতো। (সংরক্ষণের অভাবে অনলাইনে এখন যে 'ভার্সন' পাওয়া যায় তা ঝাপসা। 'বাঘ বাহাদুর'ও একই সমস্যা নিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের কাছে ধরা দেয়। বিশেষত যাদের অনলাইন ছাড়া গতি নেই।) কিন্তু তবু সিনেমার বাস্তব দর্শককে তাড়িত করবে। জাদুর মধ্য দিয়ে মানুষের মনের অদ্ভুত সব প্রবৃত্তি–যৌনতা, মায়া, হিংস্রতা–তুলে এনেছেন বুদ্ধদেব। *লাল দরজায়* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌনতার বেশ কিছু বক্তব্য ও ইঙ্গিত আছে। সেই সময়ের বাংলা সিনেমায় এমন খোলামেলা সংলাপের চল ছিল না। এর বাইরে তার সিনেমায় এসেছে বাস্তব জগতের মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম। 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান' (২০০২), 'চরাচর' (১৯৯৪) সেই সাক্ষ্য দেয়। চরাচরে পাখিদের প্রতি লখার মায়া, সারির ভালো থাকার চেষ্টা; লাল দরজা'য় মধ্যবয়সের সম্পর্ক ও যৌন টানাপড়েন; *মন্দ মেয়ের উপাখ্যানে* গণেশের সরলতা; *বাঘ বাহাদুরে* নিজের সম্মানের জন্য ঘুনুরামের জীবন বিসর্জন; জীবন বাস্তবতার সাথে তাদের এই একেকটা কাজের মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের সিনেমায় ম্যাজিকটা মূলত থাকে এই বিশেষ বিশেষ জায়গায়। আর সে কারণে তিনি বিশেষ হয়ে ওঠেন সময়ের তুলনায়। তার সিনেমায় পাওয়া যায় ভিন্নতা।

মাহমুদুর রহমান
চলচ্চিত্র আলোচক

একনজরে অন্ধ্র প্রদেশ

দেশ	ভারত
অঞ্চল	দক্ষিণ ভারত
রাজধানী	অমরাবতী
বৃহত্তম শহর	বিশাখাপত্তনম
জেলা	২৬টি
প্রতিষ্ঠা	১ নভেম্বর ১৯৫৬
সরকার	
• রাজ্যপাল	এস. আব্দুল নাজির
• মুখ্যমন্ত্রী	ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি
• বিধানসভা	দ্বিকক্ষীয় (১৭৫ + ৫৮ আসন)
• রাজ্যসভা	১১টি আসন
• লোকসভা	২৫টি
আয়তন	
• মোট	১,৬০,২০৫ বর্গকিমি (৬১,৮৫৫ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	৭ম
জনসংখ্যা (২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)	
• মোট	৪,৯৩,৮৬,৭৯৯
• ক্রম	১০ম
• ঘনত্ব	৩০৮/বর্গকিমি (৮০০/বর্গমাইল)
• সাক্ষরতা	৬৭.৪১%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও	IN-AP
সরকারি ভাষা	তেলুগু
ওয়েবসাইট	https://www.ap.gov.in

এস. আব্দুল নাজির
রাজ্যপাল

ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

অন্ধ্র প্রদেশ

শ্রেষ্ঠা শর্মা

স্বাধীন ভারতে ভাষাগত ভিত্তিতে গঠিত প্রথম রাজ্যটি হলো অন্ধ্র প্রদেশ। ১ নভেম্বর ১৯৫৬ তেলেগুভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য এই রাজ্যটি গঠিত হয়। অন্ধ্র প্রদেশের রয়েছে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। তবে ভারতে এই রাজ্যের বড় গুরুত্ব হলো এখানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়, যে কারণে অন্ধ্র প্রদেশকে বলা হয় 'ভারতের চালের ঝুড়ি।' অন্ধ্র মূলত প্রাচীন একটি জাতির নাম। সংস্কৃত সাহিত্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে, অন্ধ্র নামক একদল লোক যমুনার তীরে উত্তর ভারত ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, একসময় অন্ধ্র শাসন করতেন সাতবাহন রাজারা। পুরাণে এই সাতবাহনদের 'অন্ধ্রভৃত্য' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের মতে, সাতবাহনরা জাতিতে অন্ধ্র ছিলেন না। আবার কারও কারও মতে, সাতবাহনরা অন্ধ্রই ছিলেন। দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় তার 'ভারত ইতিহাসের সন্ধানে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন

সাতবাহনরা প্রথমদিকে কান্ব রাজবংশের প্রতি আনুগত্য ছিলেন এবং পরে তারা মৌর্যদের অধীন হন। সাতবাহনদের রাজধানী ছিল অমরাবতী। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অন্ধ্র প্রদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হলে সাতবাহনরা স্বাধীনতা লাভ করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্রদেরকে দস্যু বলা হয়েছে। ফলে ধারণা করা যায় অন্ধ্র বা সাতবাহনরা অনার্য ছিলেন। কারণ মনুসংহিতায় সাতবাহনদেরকে নীচ জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক। তিনি কান্বরাজ সুশর্মণকে পরাজিত করে স্বাধীন রাজ্য নির্মাণ করেন। তিনি শ্রীকাকুলামে তার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর রাজা হন তারই ভাই কৃষ্ণ বা কানহা (খ্রিষ্টপূর্ব ২০৭-১৮৯ অব্দ)। তিনি অন্ধ্র প্রদেশ ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ অংশ জয় করেন। তার উত্তরসূরি সাতকর্ণী ছিলেন সাতবাহন সাম্রাজ্যের সপ্তম শাসক। কথিত আছে, তিনি ৫৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন। গৌতমী পুত্র শ্রী সাতকর্ণী ছিলেন সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। এই বংশের ৩০ জন রাজার নাম পাওয়া যায় পুরাণে। মূলত যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর পর সাতবাহনদের শক্তি ক্ষয় পেতে শুরু করে। আভির জাতির আক্রমণে সাতবাহনরা তাদের রাজ্যের পশ্চিমভাগ হারায়। ইক্ষ্বাকুরা কৃষ্ণা উপত্যকা অধিকার করে নেয়। পল্লবরা দখল করে নেয় দক্ষিণ পূর্ব ভাগ–এভাবে ২২৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে অন্ধ্র প্রদেশে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় নন্দ রাজবংশের সময়ে দাক্ষিণাত্যে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যদিয়ে সেই ঐক্যও ভেঙে পড়ে। সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর অন্ধ্র ইক্ষ্বাকু রাজবংশ, পল্লব রাজবংশ, আনন্দ গোত্রিকা রাজবংশ, রাষ্ট্রকূট রাজবংশ, বিষ্ণুকুণ্ডী রাজবংশ, পূর্ব চালুক্য রাজবংশ ও চোল রাজবংশ অন্ধ্র রাজ্য শাসন করেছিল।

পুরাণে অন্ধ্র ইক্ষ্বাকুদের 'শ্রীপার্বতীয় অন্ধ্র' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের রাজধানী ছিল বিজয়পুরিতে (নাগার্জুনকোন্ডা)। অন্ধ্র ইক্ষ্বাকুরা কৃষ্ণা-গুন্টুর অঞ্চল শাসন করত। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা তথা পূর্ব অন্ধ্র এঁদের শাসনের অধীনে আসে। অন্ধ্র প্রদেশের বর্তমান ভাষা তেলুগু এই ভাষার মূল উৎসটি পাওয়া যায় ইক্ষ্বাকুদের শাসন করা গুন্টুর এলাকার কাছে পাওয়া শিলালিপি এবং খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর রেনাতি চোল রাজাদের শিলালিপিতে। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আভিরা ও তাদের সহযোগী শক্তিগুলো উপকূলীয় অন্ধ্র অঞ্চল আক্রমণ করে। এই সময়ে ইক্ষ্বাকু শাসনের পতন হয়।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবরা এই অঞ্চলের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে পল্লবরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। আসলে তারা ছিল সাতবাহন রাজাদের অধস্তন রাজকর্মচারী। শিবস্কন্দ বর্মা ছিলেন পল্লবদের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক এবং তিনি ছিলেন হিরাহাড়াগল্লির মাইদাভোলু অঞ্চলের শাসক। তিনি কৃষ্ণা অববাহিকা থেকে তার রাজ্য দক্ষিণে দক্ষিণ পেন্নার ও পশ্চিমে বেলারি পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি অশ্বমেধ ও অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে জানা যায়। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিম চালুক্য শাসক দ্বিতীয় পুলকেশী যখন অন্ধ্র আক্রমণ করেন, তখনো এই অঞ্চলে পল্লবদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

তবে এই অঞ্চলের ইতিহাসে যারা গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা রেখেছিল তারা হলো বিষ্ণুকুণ্ডী রাজবংশ। সেটা খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ইক্ষ্বাকু রাজবংশের পতনের পর বিষ্ণুকুণ্ডী রাজবংশই প্রথম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি যারা সমগ্র অন্ধ্র অঞ্চল, কলিঙ্গ ও তেলেঙ্গানার কিছু অঞ্চল নিজেদের অধিকারে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

এই অঞ্চলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ছিল সালঙ্কায়ন রাজবংশ। খ্রিষ্টীয় ৩০০ অব্দ থেকে ৪৪০ অব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী উপকূলীয় অন্ধ্র অঞ্চলে সালঙ্কায়ন রাজবংশ শাসন করেছিল। এই রাজবংশের রাজধানী ছিল পশ্চিম গোদাবরী জেলার এলুরুর কাছে ভেঙ্গি (অধুনা পেডাভেগি) শহর। এরা ছিলেন ব্রাহ্মণ শাসক। তাদের রাজকীয় প্রতীক ও গোত্র নাম শিবের বাহন নন্দীর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান

অন্ধ্র প্রদেশ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত। এটি দক্ষিণে তামিলনাড়ু, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমে কর্ণাটক, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরে তেলেঙ্গানা এবং উত্তর-পূর্বে ওড়িশা দ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব সীমানা বঙ্গোপসাগরের তীরে প্রায় ৯৭০ কিমি উপকূলরেখা রয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশকে সংযুক্ত অন্ধ্র প্রদেশ কিংবা ইউনাইটেড অন্ধ্র প্রদেশও বলা হয়ে থাকে। ১৯৫৬ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ১৯৫৬ সালে ভারতের রাজ্যগুলো পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে প্রণীত রাজ্য পুনর্গঠন আইনের মাধ্যমে এই রাজ্য গঠন করা হয়। হায়দ্রাবাদ ছিল এর রাজধানী। ২০১৪ সালের অন্ধ্র প্রদেশ পুনর্গঠন আইনের মাধ্যমে রাজ্যটি অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানা রাজ্যে বিভক্ত হয়। বিভক্ত রাজ্যটি তিনটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অঞ্চল তেলেঙ্গানা, রায়লসিমা এবং উপকূলীয় অন্ধ্র নিয়ে গঠিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তেলেঙ্গানা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ছিল হায়দ্রাবাদের নিজাম কর্তৃক শাসিত। পরবর্তীতে এটি ভারতীয় হায়দ্রাবাদের পরিণত হয়। অন্যদিকে রায়ালসীমা এবং উপকূলীয় অন্ধ্র ছিল অন্ধ্র রাজ্যের অংশ যা আবার ব্রিটিশ রাজ দ্বারা শাসিত মাদ্রাজ রাজ্যের অংশ ছিল। তেলেঙ্গানা প্রায় ছয় দশক ধরে অন্ধ্র প্রদেশের মধ্যে একটি অঞ্চল ছিল, কিন্তু ২০১৪ সালে এটি একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১০ বছরের জন্য হায়দ্রাবাদ শহরটি অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানার যৌথ রাজধানী। অন্ধ্র প্রদেশ ভারতের একমাত্র রাজ্য যার রাজধানী রাজ্যের মূল ভূখণ্ডের বাইরে অবস্থিত। এই রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ অন্ধ্র প্রদেশ-তেলেঙ্গানা সীমান্ত থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তবে অন্ধ্র প্রদেশের নতুন রাজধানী হতে চলেছে বিশাখাপত্তনম। সম্প্রতি এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি।

অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলরেখা ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম উপকূলরেখা। অন্ধ্র প্রদেশ দুটি অঞ্চলে বিভক্ত : উপকূলীয় অন্ধ্র ও রায়ালসীমা। তাই এই রাজ্যকে সীমান্ধ্র নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাজ্যের ১৩টি জেলার মধ্যে ৯টি উপকূলীয় অন্ধ্র এলাকার ও ৪টি রায়ালসীমার। বিশাখাপত্তনম ও বিজয়ওয়াড়া এই রাজ্যের দুটি বৃহত্তম শহর। পূর্বঘাট পর্বতমালা, নাল্লামালা বনাঞ্চল, উপকূলীয় সমভূমি এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপ অঞ্চল এই রাজ্যের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

আয়তন ও জনসংখ্যা

অন্ধ্র প্রদেশের আয়তন ১,৬০,২০৫ কিমি (৬১,৮৫৫ মাইল)। এটি আয়তনের হিসেবে ভারতের সপ্তম বৃহত্তম রাজ্য। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, অন্ধ্র প্রদেশের জনসংখ্যা ৪,৯৩,৮৬,৭৯৯ । জনসংখ্যার হিসেবে এটি দেশের দশম বৃহত্তম রাজ্য।

ভাষা : তেলেগু হলো অন্ধ্র প্রদেশের সরকারি এবং সর্বাধিক কথ্যভাষা। এছাড়া হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মারাঠি, উর্দু এবং ওড়িয়াসহ সীমান্ত-অঞ্চলের কিছু ভাষাও প্রচলিত রয়েছে।

পর্যটন : অন্ধ্র প্রদেশ সকলের জন্য, বিশেষ করে তীর্থযাত্রীদের দেখার জন্য একটি স্বর্গ। এরকম কয়েকটি স্থান সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

বোরা গুহা : বোরা গুহা বিশাখাপত্তনম জেলার অনন্তগিরি পাহাড়ে অবস্থিত। এই গুহাগুলো অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী এবং প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য। আপনি গুহাগুলো ঘুরে দেখতে পারেন, কাছাকাছি পাহাড়ে ট্রেক করতে পারেন এবং মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন।

তিরুপতি : অন্ধ্র প্রদেশের চিত্তুর জেলায় অবস্থিত তিরুপতি ভারতের অন্যতম তীর্থস্থান। শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির, ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরকে উৎসর্গ করা, তিরুপতির প্রধান আকর্ষণ। মন্দিরটি সোনার প্রলেপ দেওয়া গোপুরাম এবং প্রসাদী লাড্ডুর জন্য পরিচিত। হিন্দুধর্মে এই স্থানটিকে পবিত্র বলে মনে করা হয়।

শ্রীসাইলাম বাঁধ : কৃষ্ণা নদীর ওপর অবস্থিত শ্রীসাইলাম ভারতের বৃহত্তম বাঁধগুলোর মধ্যে একটি। এটি প্রকৃতিপ্রেমী এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের জন্য একটি আদর্শ জায়গা। এখানে আপনি বোটিং এবং ট্রেকিং উপভোগ করতে পারেন। এছাড়াও আপনি কাছাকাছি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যও ঘুরে দেখতে পারেন।

কোনাসিমা ব-দ্বীপ : কোনাসিমা ব-দ্বীপ পূর্ব গোদাবরী জেলায় অবস্থিত একটি মনোরম এলাকা। এটি তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহ্যবাহী শিল্প ফর্ম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। ব-দ্বীপটি নদী দ্বারা বেষ্টিত এবং দর্শনার্থীদের একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

আরাকু উপত্যকা : আরাকু উপত্যকা হলো বিশাখাপত্তনম জেলায় অবস্থিত একটি পাহাড়ি স্থান। এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং কফি বাগানের জন্য বিখ্যাত। উপত্যকা শহরের কোলাহল থেকে দূরে একটি শান্তিপূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এছাড়াও আপনি এখানে ট্রেকিং করতে যেতে পারেন–কাছাকাছি জলপ্রপাত দেখতে পারেন এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

শিল্প-সংস্কৃতি ও উৎসব

অন্ধ্র প্রদেশে সবাই একসাথে প্রতিটি ধর্মের উৎসব পালন করে। দীপাবলি, মকরসংক্রান্তি, হোলি, ঈদ-উল-ফিতর এবং অন্যান্য উদ্‌যাপনগুলো সাড়ম্বরে পালিত হয়। রায়ালসীমা ফুড ফেস্টিভ্যাল, বিশাখা উৎসব এবং ডেকান ফেস্টিভ্যালসহ বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আরও উল্লেখযোগ্য উৎসব হলো লুম্বিনী, তিরুপতি, পোঙ্গল এবং উগাদি। কুচিপুড়ি ও ভামকলাপম নৃত্য অন্ধ্র প্রদেশকে আলাদাভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বিশেষ করে কর্ণাটক সঙ্গীত এখানে খুবই জনপ্রিয়। সাহিত্যেও অন্ধ্র প্রদেশ পিছিয়ে নেই। এখানকার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নান্নাইয়া, টিক্কানা, ইয়েররাপ্রগাদা প্রমুখ। চলচ্চিত্রেও পিছিয়ে নেই এই অঞ্চল। বলিউডকে তো টিক্কা দিচ্ছেই, সেই সাথে তেলেগু সিনেমা গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে অন্ধ্র প্রদেশের একটি গৌরবান্বিত নাম হলো ব্রহ্মানন্দম। অন্ধ্র প্রদেশের সত্যেনাপল্লিতে জন্ম ব্রহ্মানন্দমের। পুরো নাম কান্নেগান্তি ব্রহ্মানন্দম। ১৯৮৫ সালে 'আহা না পেলান্ত্রা' ছবিটি দিয়ে অভিনয় জগতে হাতেখড়ি হয় এই অভিনেতার। এই অভিনেতা ১১০০টি সিনেমায় অভিনয় করে গিনেস রেকর্ড বুকে নাম লিখিয়েছেন।

খাবার

অন্ধ্র প্রদেশের রন্ধনপ্রণালী উল্লেখযোগ্যভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। লাল মরিচের গুঁড়া, তেঁতুল এবং সরিষার বীজ হলো এ অঞ্চলের জনপ্রিয় খাবার। এছাড়া রয়েছে গরম আচার, টক রসম, চিকেন বা মাটন বিরিয়ানির মতো জ্বলন্ত তরকারি এবং গোঙ্গুরা গাছের টক পাতা থেকে উৎপন্ন সুপরিচিত গোঙ্গুরা পাচাদি। অন্ধ্র প্রদেশে কলাপাতায় খাওয়ার ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার নিরামিষ থালি খুব নাম করা। থালি শব্দটা থালা থেকে এসেছে। কলাপাতার থালিতে ঘি সমেত নিরামিষ খাবার খুব সুস্বাদু।

শ্রেষ্ঠা শর্মা
সংস্কৃতিকর্মী

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯

এক্সটেনশন : ১১৪২

inf2.dhaka@mea.gov.in

ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

অনূদিত কবিতা

গিরধর রাঠির কবিতা

গিরধর রাঠির জন্ম ১৯৪৪ সালে ভারতের মধ্যপ্রদেশ। সুপরিচিত কবি অশোক বাজপেয়ির মতে, 'গিরধর রাঠি হিন্দি সাহিত্যের সেই কবিদের একজন যিনি, ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতাকে কবিতার ভাষায় এক অন্যরূপ দিতে চেয়েছেন। আত্ম অন্বেষণের পাশাপাশি তিনি কবিতায় জীবনের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কথাও বলেছেন। তার কবিতার অধিকাংশ শান্ত স্বর এই সময়ের সামাজিক জীবনে একটা আলাদা ধারা তৈরি করে।' গিরিধর রাঠি হিন্দি সাহিত্য একাডেমির ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য' এর দীর্ঘমেয়াদী সম্পাদক ছিলেন। চারটি কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি গদ্য-পদ্য মিলিয়ে এ পর্যন্ত তার ১৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দি থেকে ভাষান্তর করেছেন **অজিত দাশ**

পুল

নদী স্থির
পুল বইছে

দুই পাড় মিলিয়ে দেওয়া পুল
বইছে
ঠিক নদীর বিপরীত দিকে

আত্মহত্যা করতে যাওয়া পুল
উঁচু পাহাড় থেকে লাফিয়ে
ভেঙে যাবে

আর পুলে দাঁড়িয়ে থাকা আমি
যে কিনা তোমার দিকে ছুটে যেতে চাইছি
অথবা আমার মতো দ্বিতীয় কেউ
এই পুলের ওপরে

তখনো নদী বইতে থাকবে
পুলের টুকরো বুকে জড়িয়ে
রক্তের রেখা ছুটে চলবে?

চুপিসারে

আরও বহু কিছু ছিলো;
সামান্যতে, কিন্তু, এটাই
প্রথম ভয় ছিলো

আর এখন লালসা।

প্রতীতি

আমি
আমার চারপাশে প্রতিচ্ছবি।
প্রতিচ্ছবি তুমি।
তুমি মাত্রই
প্রতিচ্ছবি।

অজানায় এইটুকুই কত ভার!

তুমি জলের ভেতর
কঙ্কর ছুড়ে মারছ।

ফুল কোলাহলে

সিমেন্টের দালানে
ফুল ফুটে আছে।
যেতে যেতে থেমে যায় মেহমান
তারপর একবার মদিরার
কোলাহল

দালানের ফুল হারিয়ে গেছে।

পথের মোড়ে বেদনা

যেতেই হবে।

ছেড়ে যাব
বোঝাই করা স্মৃতি
নিজের জয়
না চেয়ে।

সেখানে বেঁধে রাখা একটা চুরি
মুক্ত মনের উজ্জ্বল অশ্রুর স্মারক।

যদি কোনো হাসি সেখানে
চিকচিক করে
ক্ষমা করে দিয়ো!

দ্বিতীয় চেহারা

ভরসা অথবা অবিশ্বাস কেবল এইটুকুই
এখন দৃঢ়
আরও দৃঢ়তর হচ্ছে
চেহারা বদলাতেই দুঃখ
সুখ হবে
মৃত্যু অমরত্ব
বিস্ময় অলসতা

দূরত্ব এত যৎসামান্য
আমাদের হ্যাঁ ও না এর মাঝে!

বিজ্ঞান

মেঘনাদ সাহা
ভারতের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী

সন্দীপন ধর

১৯২০ দশকের গোড়ার দিকে বিশ্বে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আগমনের ঘোষণা দেয়। ১৯২০-১৯২৫ সালের মধ্যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পাথব্রেকিং আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনগুলো করেছিলেন যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং অনেক তরুণ পেশাদারকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।
সি ভি রমন, সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর, রামানুজনের মতো বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন আর একজন ভারতীয় বাঙালি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা যারা বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন বিশ্বদরবারে

সাহা বিশ্বকে তাপীয় আয়োনাইজেশন সমীকরণ দিয়েছেন, যা 'সাহা সমীকরণ' নামেও পরিচিত। সাহার সমীকরণ হলো জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে তার সবচেয়ে স্বীকৃত অবদান যা তাপমাত্রা এবং চাপের সাথে একটি উপাদানের আয়নকরণ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তত্ত্বটি তারার বর্ণালি শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করেছিল। তিনি ও তার সহপাঠী এবং সহকর্মী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম আলবার্ট আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার সূত্রকে জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন যা পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন, ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং পদার্থবিজ্ঞানী, গ্যালিলিওর ১৬০৮ সালে টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর থেকে সাহার সমীকরণকে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় দশম সবচেয়ে অসামান্য আবিষ্কার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

নির্বাচনী স্পেকট্রোস্কোপি, সৌর করোনা, সৌর রেডিয়ো নির্গমন, আণবিক বিচ্ছিন্নতা, আয়নোস্ফিয়ারে রেডিয়ো তরঙ্গের প্রচার, বিকিরণ চাপ এবং বিটা তেজস্ক্রিয়তার মতো অন্যান্য বিষয়ে তার কাজ এখনো বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে স্বীকৃত।

মেঘনাদ সাহার জীবন এবং পটভূমি

সাহা অবিভক্ত ভারতের ঢাকা জেলার সেওরাতলী গ্রামে ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর পিতা জগন্নাথ সাহা এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আট ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম সন্তান ছিলেন। তার বাবার একটি দোকান ছিল এবং বাড়ির আর্থিক অবস্থার কারণে বাড়ির বাচ্চারা স্কুলে পড়া ছেড়ে দেয়। ছেলেরা হয় বাবাকে দোকানে সাহায্য করত অথবা কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। কিন্তু সাহার ভাগ্য তার বাকি ভাইবোনদের থেকে আলাদা ছিল। আর্থিক সমস্যাগুলো শিক্ষার প্রতি তার গভীর আগ্রহকে নিরস্ত করতে পারেনি।

গ্রামের টোলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। সেই সময় তার গ্রামের বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার সুযোগ ছিল। তার পিতা ছোটবেলায় তার বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা দোকানের কাজ শেখা আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু দাদা জয়নাথ এবং মায়ের আন্তরিক চেষ্টায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ইতিহাস এবং গণিতের মেধার কথা পিতার কাছে অবগত করলে হাই স্কুলে ভর্তি করতে সম্মত হন। এরপর তিনি শেওড়াতলী গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে শিমুলিয়ায় মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে (মিডল স্কুল-ব্রিটিশ আমলে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি পড়ার স্কুল) ভর্তি হন। এত দূরে প্রতিদিন যাওয়া আসা করে তার পক্ষে পড়াশোনা করা দুরূহ হওয়ার পাশাপাশি মেঘনাদের বাবার পক্ষেও আর্থিক সামর্থ্য ছিল না শিমুলিয়া গ্রামে মেঘনাদকে রেখে পড়ানোর। তখন মেঘনাদের বড় ভাই এবং পাটকল কর্মী জয়নাথ শিমুলিয়া গ্রামের চিকিৎসক অনন্ত কুমার দাসকে মেঘনাদের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করায় তিনি রাজি হন এই শর্তে যে সে তাঁর বাড়ির বিভিন্ন কাজকর্মে সাহায্য করবে। সেখানে তিনি শিমুলিয়ার ডাক্তার অনন্ত নাগের বাড়িতে থেকে বাড়ির গরু লালন-পালন করে, এবং বাড়ির দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পন্ন করে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ লাভ

করেন। এই স্কুল থেকে তিনি শেষ পরীক্ষায় ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান।

এরপর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে সারাবাংলা উত্তাল হয়েছিল। সেই সময় তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য তৎকালীন গভর্নর বামফিল্ড ফুলার আসলে মেঘনাদ সাহা ও তার সহপাঠীরা বয়কট আন্দোলন করেন। ফলত আন্দোলনকারী সহপাঠীদের সঙ্গে তিনিও বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন এবং তার বৃত্তি নামঞ্জুর হয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী কিশোরীলাল জুবিলি হাই স্কুলের একজন শিক্ষক স্বপ্রণোদিত হয়ে তাকে তাদের স্কুলে ভর্তি করে বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকেই তিনি ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মাসিক ৪ টাকার সরকারি বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় গণিত এবং ভাষা বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর অধিকার করেন। বিদ্যালয় শিক্ষার পর তিনি ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বৈশ্য সমিতির মাসিক দুই টাকা বৃত্তিও লাভ করেন। সেই সময় তিনি কলেজের রসায়নের শিক্ষক হিসেবে হরিদাস সাহা, পদার্থবিজ্ঞানে বি এন দাস এবং গণিতের নরেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কে পি বসুসহ প্রমুখ স্বনামধন্য শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি বিজ্ঞান ছাড়াও ডক্টর নগেন্দ্রনাথ সেনের কাছে জার্মান ভাষার প্রশিক্ষণ নেন। এই বিদ্যালয় থেকে তিনি আইএসসি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে গণিতে অনার্স নিয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় ১৯১১-১৯১৩ সাল পর্যন্ত দুবছর ইডেন ছাত্রাবাস এবং পরে একটি মেসে থেকে পড়াশোনা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ তার সহপাঠী ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সংখ্যাতত্ত্ব বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এক বছরের এবং রসায়নবিদ নীলরতন ধর দুই বছরের সিনিয়র ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি গণিতের অধ্যাপক হিসেবে বি এন মল্লিক এবং রসায়নে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং পদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুকে পেয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ সালে গণিতে সম্মানসহ স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম হন।

১৯২৮ সালে তার সমস্ত গবেষণার ফলাফল একত্র করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রির জন্য আবেদন করেন। সব গবেষণা বিবেচনা করার জন্য উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার থিসিস পেপার বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বিদেশে অধ্যাপক ডাবলু রিচার্ডসন, ড. পোর্টার এবং ড. ক্যাম্বেল থিসিস পেপার পর্যালোচনা করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯১৯ সালে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী তারকনাথ পালিত রাজবিহারী ঘোষের অর্থানুকূল্যে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম পঠনের জন্য রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ উদ্বোধন করেন। সেসময় উপাচার্য মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্নাতকোত্তরের ফল ভালো থাকায় তাদের গণিত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তারা দুজনেই গণিতের প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাদের পদার্থবিজ্ঞান পছন্দসই বিষয় হওয়ায় উপাচার্যের অনুমতি নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসেন। গণিত বিভাগের প্রভাষক থাকাকালীন মেঘনাদ সাহা জ্যামিতি ও ভূগোলের বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন। ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত আগ্রহ থেকেই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ভূতত্ত্ববিদ্যা পাঠক্রমের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি ভূতাত্ত্বিক সময় নিরূপণ বিষয়ের ওপর গবেষণা করেছিলেন। এর পাশাপাশি, সাহা পদার্থবিদ্যায় গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু কলেজের অপর্যাপ্ত বাজেটের কারণে তার গবেষণাপত্রগুলো জার্নালে প্রকাশিত হতে পারেনি। সেই সময়ে গবেষণাগার এবং গবেষণা সরঞ্জামের অভাবে, সাহার গবেষণা প্রায়শই বিলম্বিত হতে থাকে।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে দেবেন্দ্রমোহন বসু গবেষণার জন্য জার্মানিতে যান কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য অন্তরিন হয়ে পড়ায় মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিয়োজিত হতে হয়। সেই সময় প্রবীণ অধ্যাপক ছাড়াই মেঘনাদ সাহা পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এস কে মিত্র, পি এন ঘোষয়ের সহযোগিতায় তিনি পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পড়ানোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিনি প্রভাষক হিসেবে তাপ গতিবিদ্যা পড়াতেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিষয়গুলো তিনি ও তার সহযোগীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন। আপেক্ষিকতাবাদসহ আধুনিক পদার্থবিদ্যার সদ্য আবিষ্কৃত বিষয়গুলো তারা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়গুলোর মূলত জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হতো, সেগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হয়েছিল। ঢাকা কলেজে পড়াকালীন জার্মান ভাষা শিক্ষা এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিল।

সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের তিন বছরের মধ্যেই তিনি ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু সেটা জার্মান থেকে অনুবাদ করেছিলেন যা ইংরেজি ভাষায় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সর্বপ্রথম অনুবাদ। প্রিন্সটনের আইনস্টাইন আর্কাইভে তাদের অনুবাদের একটি প্রত্যায়িত রাখা আছে।

১৯১৭ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনো প্রবীণ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধান ছাড়াই তিনি লন্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন ও ফিজিক্যালি রিভিউ জার্নালে মৌলিক গবেষণাগুলো প্রকাশ করেন। বিকিরণ চাপ সম্পর্কিত গবেষণা জন্য ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।

সৌভাগ্যবশত, ১৯১৯ সালে, তিনি 'হার্ভার্ড ক্লাসিফিকেশন অফ স্টেলার স্পেকট্রা' বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে যান। এই বৃত্তি দ্বারা তিনি দুই বছরের জন্য ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং তিনি আলফ্রেড ফাওলার এবং ওয়াল্টার নার্নস্টের মতো বিজ্ঞানীদের ল্যাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯২০ সালে, সাহা তাপীয় আয়নিকরণ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন এবং 'অরিজিন অফ লাইনস ইন স্টেলার স্পেকট্রা' বিষয়ে থিসিস তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করার সুযোগ করে দেয়।

মেঘনাদ সাহা ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে তার গবেষণালব্ধ তাপীয় আয়নায়ন তত্ত্ব বিষয়ে Ionisation of the solar chomosphere শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। তার গবেষণাটি মূলত উচ্চ তাপমাত্রায় আয়নায়ন তত্ত্ব ও নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে তার প্রয়োগ নিয়ে।

তিনি ইউরোপ যাত্রার আগে Ionisation of the solar chromospher and on the Harvard classification of steller spectra গবেষণাপত্র দুটি প্রকাশের জন্য Philosophical Magazine এর কাছে পাঠান কিন্তু সেখানে ফাউলারের গবেষণাগারে থাকাকালীন হার্ভার্ড গ্রুপ ছাড়াও নক্ষত্রের শ্রেণিবিভাগে লাইকার ও ছাত্রদের অবদান সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর তিনি আরও কিছু নতুন তথ্য দিয়ে তার দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি সম্প্রসারিত করেছেন। যা On the physical theory of steller sprectra শিরোনামে লন্ডনের রয়েল সোসাইটি পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তার এই কাজটি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করা হয়। এস রজল্যান্ড Theoretical Astrophysics গ্রন্থে তার গবেষণার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

দেশে ফেরার পরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে খয়রা অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সেই সময় তৎকালীন আচার্য ও গভর্নরের সঙ্গে উপাচার্যের মতবিরোধ থাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে সহকারী পাননি। সেকারণে গবেষণার জন্য তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক নীলরতন ধরের আগ্রহে ১৯২৩ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং এখানে তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর অধ্যাপনার সাথে যুক্ত থাকেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ভালো পরিমণ্ডল না থাকা সত্ত্বেও তার চেষ্টায় তিনি একটি গবেষণা দল করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, পরমাণু ও অণুর বর্ণালি, নেগেটিভ ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি, অণুর উষ্ণতাজনিত

বিভাজন, আয়নোস্ফিয়ারে রেডিয়ো তরঙ্গের গতিবিধি, উচ্চতর আবহমণ্ডল ইত্যাদি। তিনি তাপীয় আয়নায়ন তথ্য পরীক্ষার জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি থেকে ১৫০০ পাউন্ড আর্থিক সাহায্য পান, তা দিয়ে আয়নতত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ করেন। এখানে থাকাকালীন বিখ্যাত বই 'A Treatise on Heat' লেখা সম্পন্ন করেন। এমনকি তাঁর অবদানগুলোর জন্য ১৯২৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের (পদার্থবিদ্যা বিভাগ) সভাপতিত্ব লাভ করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ইতালিতে সরকারের আমন্ত্রণে ভোল্টার শতবার্ষিকী উৎসবে আমন্ত্রিত হন এবং মৌলিক পদার্থের জটিল বর্ণালির ব্যাখ্যা সম্পর্কে গবেষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কারনেসি ট্রাস্টের ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐসময় তিনি জার্মানি, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা পরিদর্শন করেন। সেই সময় হার্ভার্ড কলেজের ল্যাবরেটরিতে এইচ শেফ্লির সাথে গবেষণা করেন।

তিনি মিউনিখে থাকাকালীন জার্মান একাডেমি সংবর্ধনা পান। আমেরিকায় লরেন্সের সাইক্লোট্রন যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করেন। যা পরবর্তীতে ভারতবর্ষে সাইক্লোট্রন তৈরিতে সাহায্য করেছে।

কোপেনহেগেন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কনফারেন্সে পরমাণু বিভাজনের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হন যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গবেষণাগার তৈরিতে তাকে সাহায্য করেছে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় সাইন্স কংগ্রেস জুবিলি অধিবেশনে এরিংটন কলকাতা আসেন। তিনি মেঘনাদ সাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন তার মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জন্য একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্ণ গবেষণাগার থাকা উচিত। তিনি আরও বলেন গ্যালিলিওর দুরবিনের পর সেরা ১০টি আবিষ্কারের মধ্যে তার একটি। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে ব্যাঙ্গালোরে ভারতে এই ধরনের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরবর্তীতে ১৯৩৮ সালে, তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। এখানে তিনি শিক্ষার উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ নেন। কলকাতায় ফিরে আসার পর তার গবেষণার মূল বিষয় ছিল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। তিনি বার্কলের লরেন্সের সাইক্লোট্রন ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করার পরেই ভারতেও অনুরূপ সাইক্লোট্রন তৈরির পরিকল্পনা করেন। এলাহাবাদে সেই সুযোগ না থাকায় তিনি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। কলকাতায় তিনি পুনরায় পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার ছাত্র ও সহকর্মী বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরীকে পিএইচডি ডিগ্রি করার জন্য লরেন্সের কাছে পাঠান। একই সাথে উদ্দেশ্য ছিল সাইক্লোট্রন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তার সাহায্যে সাইক্লোট্রন ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অটো হান ও মিনারের পরমাণু বিভাজন গবেষণা সফল হলে তিনি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আরও বেশি আগ্রহী হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পাঠ্যসূচিতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স অন্তর্ভুক্ত করেন। টাটা ট্রাস্টের অনুদান এবং বিধানচন্দ্র রায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রন তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে নাগ চৌধুরী ভারতে ফিরলে সাইক্লোট্রন তৈরি প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে শক্তিশালী চৌম্বক তামার পাত পৌঁছে যায়। কিন্তু যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকুয়াম পাম্পগুলো যে জাহাজে আসছিল তা জাপানি টর্পেডো আঘাতে ডুবে যায়। সেই সময় তিনি অন্য উপায় না দেখে সিএসাইয়ারের (CSIR) অনুদানে ভ্যাকুয়াম পাম্প তৈরির পরিকল্পনা নেয়। মিমি পারদ ভ্যাকুয়াম পাম্প তৈরি করলেও সাইক্লোট্রন এর উপযোগী বড় পাম্প তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মেঘনাদ সাহা ভারতে বায়োফিজিক্স গবেষণার সূত্রপাত করেন। এরপর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নীরজনাথ দাশগুপ্ত তার তত্ত্বাবধানে ভারতে প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেন। এরপর তিনি ভারতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউট তৈরির কাজে ব্রতী হন। ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে পদার্থবিজ্ঞানে ট্রেনিং দেওয়া ও মৌলিক গবেষণা করা। তিনি মারা যাবার আগ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এমএসসিতে ভারতের প্রথম পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমটি ১৯৪০ সালে সাহা দ্বারা তৈরি এবং তিনি ভারতের প্রথম সাইক্লোট্রনও তৈরি করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৫) এবং ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (১৯৫০) শুরু করেছিলেন।

স্বনামধন্য এই পদার্থবিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ধারায় পঞ্জিকা সংশোধন করেন। এছাড়া ভারতের নদীনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ভারতে পদার্থবিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের জন্য ১৯৩১ সালে ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স, ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ১৯৩৪ সালে ভারতে পদার্থবিজ্ঞানীদের সংগঠন ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটিও প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্যোগেই ভারতে ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অব সায়েন্সের সূচনা হয়, যা বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অব টেকনোলজি (আই.আই.টি.) নামে পরিচিত।

সাহা ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও সক্রিয় ছিলেন এবং পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কট্টর সমর্থক ছিলেন। ১৯৫২ সালে ভারতীয় লোকসভার নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র (বর্তমানে কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র) থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাংসদ হন। এমপি হিসেবে সাহার প্রচেষ্টার কারণেই ১৯৫৬ সালে সাকা ক্যালেন্ডার বা ভারতীয় জাতীয় ক্যালেন্ডার গৃহীত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, ভারতের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মেঘনাদ সাহার কাজ এখনো সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের দ্বারা প্রাসঙ্গিক এবং সম্মানিত। এক অল্প বয়স্ক ছেলে যার স্বপ্ন ছিল পড়াশোনায় পারদর্শী হয়ে ওঠা সেখান থেকে আজ তিনি বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

সন্দীপন ধর
জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষক IUCCA, পুনে।
বিজ্ঞান সঞ্চারক ও একজন বিজ্ঞান লেখক।

লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। –সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....
Address :..... Bank Account Name :.....
..... Account No :.....
..... Bank Name :.....
Phone/Mobile :..... Branch Name :.....
e-mail :..... Routing No :.....

উৎসব

ঋগ্বেদে নদী থেকে বাগ্‌দেবী সরস্বতী

সরস্বতী রানী পাল

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম লিখিত বিবরণ আমরা পাই বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য থেকে। বৈদিক সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে দেবভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈদিক সাহিত্যের বহুগ্রন্থে বেদের দেবতাতত্ত্বের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সরস্বতী বৈদিক দেবীদের অন্যতম, ঋদ্বেদ-সংহিতার স্ত্রী-দেবতাদের মধ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা কখনো পৃথক পৃথক মন্ত্রে বা ঋকে, তৃচে (তিনটি ঋকে), কখনো-বা সম্পূর্ণ সূক্তে স্তুতি করেছেন। ঋক্ সংহিতায় সর্বসমেত পাঁচটি সূক্তে সরস্বতীর স্তুতি করা হয়েছে। এই সূক্ত পাঁচটির মধ্যে তিনটিতে (৬/৬১, ৭/৯৫, ৭/৯৬) সমগ্র সূক্ত জুড়ে সরস্বতী স্তুত হয়েছেন। অবশিষ্ট সূক্তদ্বয়ের মধ্যে একটিতে মাত্র তিনটি ঋকে (ঋ.১/৩/১০-১২) সরস্বতীর বন্দনা রয়েছে এবং আরও একটি সূক্তে সরণ্যু, পুষা, আপন প্রভৃতির সঙ্গে সরস্বতী সম্পর্কিত মন্ত্রও পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুত ঋক্-সংহিতায় প্রায় ৮০টি ঋকে সরস্বতীর স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। Dr. Raghunath Airi Zuvi 'Concept of Saraswati' নামক গ্রন্থের প্রথমেই মন্তব্য করেছেন 'Saraswati has been praised and prayed to in the Rv in about eighty res' –

তাই তিনি একাধারে সূক্তভাক্ ও মন্ত্রভাক্ দেবতা। তাছাড়া, সামবেদ, শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী-সংহিতা ও অথর্ববেদ-সংহিতাতেও সরস্বতীর প্রসঙ্গ চোখে পড়ে। বেদের 'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যক' অংশেও সরস্বতীর বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

'সরস্বতী' এই শব্দটির সঙ্গে আমরা এতই পরিচিত যে, পরবর্তীযুগে বাগ্‌দেবীরূপিণী সরস্বতীর সঙ্গে বৈদিক সরস্বতীর যে বিশেষ প্রভেদ আছে, তা অনেক সময় বোঝা যায় না। 'নিঘন্টু' নামে বৈদিক শব্দের সংকলন-গ্রন্থে দেখা যায় যে, 'সরস্বতী' শব্দটি বাক্-নাম, নদী-নাম ও দেবতা-নামের মধ্যে পঠিত হয়েছে। গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হতে 'সরস্বতী' শব্দ নিস্পন্ন। সরস্বতী শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে–সরস্+বতুপ্+ঈপ্। 'সরস্' শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ, জল এবং অমৃত। 'সরঃ' শব্দের অর্থ গতি, 'সরস' মানে বহমান জল, জলাশয় এবং সরস্বতী অর্থাৎ জলপূর্ণ। তাই, এই জ্যোতির্ময়ী দেবী সরস্বতী জ্ঞানের জ্যোতিতে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করেন। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার আকুতি তাই ঋষি-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে–'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। মৃত্যু হতে অমৃতের পথে গমনের ইচ্ছা আছে বলেই 'মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়'। উপনিষদে বলা আছে–বিদ্যার দ্বারাই অমৃতকে লাভ করা যায়–'বিদ্যায়াহমৃতমশ্নুতে'। সেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী যিনি–'অমৃত' অর্থে সরস্+বতী, তিনিই হলেন সরস্বতী। যাস্কাচার্যের মতে, 'সরস্বতী সর ইত্যুদকনাম সর্তেস্তদ্বতী' (নি.৯/২৬/৬)।

প্রবাহযুক্ত বলেই নদীর নাম 'সরস্বতী'। নদীর বয়ে যাওয়া কোনো অন্ধকার উৎস পর্বতকন্দর থেকে। তাই বিদ্যা বিষয়ে বলা হয় 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। এই যে মুক্তির ধারণা তা হয়তো জলাধারের উৎসত্যাগও নিরন্তর প্রবাহ দর্শনে প্রাচীন ঋষিগণ লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন মন্ত্রে সরস্বতী বাক্‌রূপিণী অথবা নদীরূপিণী রূপে স্তুত হয়েছেন। ঋক্-সংহিতায় মোট পঁয়তাল্লিশ বার সরস্বতী নদীর উল্লেখ রয়েছে, গঙ্গা নদীর উল্লেখ দু'বার এবং যমুনা নদীর উল্লেখ রয়েছে তিনবার। নদীর বিশীর্ণতা শুরু হতেই নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, অন্নদায়িনী সম্পদদায়িনী সরস্বতী কালক্রমে হয়ে ওঠেন নদীসমূহের মধ্যে সপ্তম স্থানীয় এবং অবশেষে বিদ্যার দেবী। সরস্বতীর নদীরূপটি বেশ প্রাচীন। সরস্বতী নদীর বহু উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যের বহুস্থানে বর্তমান। তাই সরস্বতীর দেবীরূপের পাশাপাশি নদীরূপটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদের অনেক অংশে সরস্বতী একটি নদীরূপে উল্লিখিত এবং এর জল পুণ্য দান করে বলে বিশ্বাস। তাই সরস্বতীকে নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। তাই তিনি 'নদীতমা' (নদীতমে'-ঋ.২/৪১/১৬)। জলগুলিকে দৈব বলে মনে করা হয়েছে এবং 'আপঃ' শব্দের অর্থ 'নদীসমূহ' এবং সরস্বতী হলো তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সব বৈদিক জল তার সঙ্গে যুক্ত।

নদী চির-প্রবহমান। তাই সরস্বতী চির সমৃদ্ধ এবং মানসিকভাবে যেন অনুপ্রেরণার উৎস। সরস্বতীকে বাক্ হিসেবে মনে করার কারণ বাক্ বর্ণে প্রবহমান, শব্দে বাক্যে এবং বাক্যসমূহে বহমান। তাই সরস্বতী 'নদী' এবং 'বাক্' দুটিকেই বোঝায়। সরস্বতী যখন নদী, তখন প্রাণোচ্ছলতায় নদীদের মধ্যে তিনি পরমা। চেতনাময়ী তিনি, পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এমন করে আর কেউই আসেন না আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে, যেমন আসেন সরস্বতী–সিন্ধুদের দ্বারা স্তুত হয়ে। ঋক্ সংহিতায় নদীসূক্তে একুশটি সিন্ধুর কথা পাওয়া গেছে, সেখানে–'গঙ্গে যমুনে সরস্বতি'। ঋক্ সংহিতা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, এক সময় সরস্বতী নদীর তীরেই বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। সেজন্যই আর্যমানসে সরস্বতীর অধ্যাত্মভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবার একজায়গায় আর একটি প্রাচীন ত্রয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সরস্বতী নদীর জলরাশি স্বচ্ছ ও নির্মল, অর্থাৎ পবিত্রতোয়া, যার জলে অবগাহনাদির দ্বারা শরীর ও মন শীতল এবং শুদ্ধ হয়। এছাড়া তিনি ধনাঢ্যজন-পদবেষ্টিতা কৃষির সহায়ক তথা নদীপথে বাণিজ্যের আনুকূল্য দানপূর্বক ধনদানকারিণী। সরস্বতীর নদীরূপত্ব সর্বাধিকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বাদশ ঋকে। নদী সরস্বতীর বর্ণনা দিয়ে এই ঋকের আরম্ভ, কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটেছে দেবী সরস্বতীর দৈবস্বরূপ অনুচিন্তনে। আসলে নদী সরস্বতীর উপমা দ্বারাই পুরো ঋকে দেবী সরস্বতীর মহিমাই অভিব্যক্ত হয়েছে।

বৈদিক যুগে নদী সরস্বতীই ছিল দেবী সরস্বতীর স্থূলবিগ্রহ। দেবী-সরস্বতীর অমূর্ত ভাব নদী সরস্বতীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেই যেন জ্ঞান-পিপাসু

বীণা যন্ত্রের তাল ও লয় সংযোগ দেববন্দনামূলক অপূর্ব গীতকলার সৃষ্টি হতো। সামগায়কের সেই মোহন বীণাখানি অর্পিত হয় দেবীর করকমলে। তিনি হন বীণাপাণি। তাঁর বীণার নাম 'কচ্ছপী'

আর্যেরা এই নদীকে 'মাতৃ' সম্বোধনে সম্বোধিত করে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু কোন সময়ে বহু আর্যকে সরস্বতীর উপকূল পরিত্যাগ করে ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়তে হয়। প্রয়োজন হয় নতুন সাকার অপরূপ মূর্তি-বৈভব প্রকাশ হয়, এখন সেই মূর্তিই মাটির প্রতিমায় ঘরে ঘরে পূজিত হয়। সেই মূর্তিভাবনাতেই সরস্বতীর 'দেবীরূপ' এবং 'নদীরূপ' ভাব সংরক্ষিত আছে বলেই গবেষকগণ মনে করেন। দেবী-সরস্বতীর জ্যোতিঃ-বিভূতি এবং নদী-সরস্বতীর নিষ্কলুষ স্বচ্ছতা–এই উভয়ের সমন্বয়ে দেবী হন শ্বেতবর্ণা এবং সর্বশুক্লা। তাঁর বসন, ভূষণ ও বাহন হয় শ্বেতবর্ণের। কলকল্লোলময়ী নদী সরস্বতীর বিশাল তটে শ্রুতিগোচর হতো সামসঙ্গীত। বীণা যন্ত্রের তাল ও লয় সংযোগ দেববন্দনামূলক অপূর্ব গীতকলার সৃষ্টি হতো। সামগায়কের সেই মোহন বীণাখানি অর্পিত হয় দেবীর করকমলে। তিনি হন বীণাপাণি। তাঁর বীণার নাম 'কচ্ছপী'। অগণিত ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, বেদানুশীলনরত ঋসি, মুনি ও বিদ্যার্থীরা বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত আশ্রয়পূর্বক এই দেবীর সাধনা করতেন, সেই ভাবটি নিয়ে দেবী হন 'পুস্তকশ্রী'। এছাড়া, দেবী শ্বেত-পদ্মাসনা এবং হংসবাহনা। কারণ, এই বস্তুদুটি নদী-সরস্বতীর দান। নদীর দুকূল আলোকিত করে বিকশিত থাকতো অসংখ্য পদ্ম এবং তার তরঙ্গায়িত সলিলে অবাধে বিচরণ করতো অসংখ্য কলহংস। প্রথমটি হয় দেবীর আসন, দ্বিতীয়টি হয় দেবীর বাহন। জ্ঞানের সামূহিক ভাবসম্পদ আহরণ-পূর্বক দেবীর মূর্তিরচনা করা হলেও তিনি হয়ে রইলেন নদীলক্ষণা দেবী সরস্বতীর মাটির প্রতিমার নিম্নভাগে সেই নদীচিহ্নটি আজও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

নদীশ্রেষ্ঠা-দেবীশ্রেষ্ঠা-জননীশ্রেষ্ঠা

নদী-সরস্বতী আর্যভূমি সপ্তসিন্ধুর সর্বপ্রধান নদী ছিল, এ সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই। সরস্বতী নদীশ্রেষ্ঠা-দেবীশ্রেষ্ঠা-জননীশ্রেষ্ঠা; তাই সংস্কৃত ভাষায়–'অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী।' নদী সরস্বতী কেবল যে বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ ছিল তা নয়। মহাভারতে, পুরাণে কাব্যে সরস্বতী পূতসলিলা নদীরূপে কীর্তিত হয়েছেন। রামায়ণে বাণী সরস্বতীও বাগ্‌দেবী। মহাভারতের শল্যপর্বে গদাযুদ্ধপর্বের অন্তর্গত বলদেবতীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বলদেব বলেছেন, সরস্বতী-তীরে বাসের মতো সুখ কোথাও নেই–গুণও কোথাও নেই।

যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, সরস্ বা জল সমন্বিত মর্ত্যের নদী সরস্বতীর সাদৃশ্যে আকাশের ছায়াপথ বা Milkay Way কে দিব্য বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী কল্পনা করা হয়েছে। এক সরস্বতী ত্রিলোকব্যাপিনী সূর্যাগ্নির দ্যুতি, আর এক সরস্বতী নদী। দুই সরস্বতী মিলেমিশে একাকার হয়ে এক সরস্বতী দেবতার আকার পরিগ্রহ করেছিল। বেদে প্রধানত নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। বৈদিক সরস্বতী বাগাধিষ্ঠাত্রী বা বাগ্‌দেবীরূপেও বর্ণিত হয়েছেন। বৈদিক সাহিত্যের বিবরণে জানা যায়, সরস্বতী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ রাজাগণ এবং প্রসিদ্ধ পঞ্চজাতিও বাস করতেন। সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞের আগুন জ্বেলে সেখানে ঋষি লাভ করেছিলেন বেদ, ঋকমন্ত্র। পুরাণে ও পুরাণোত্তর আধুনিককালে সরস্বতী বাক্য বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবীরূপে প্রসিদ্ধ। পরবর্তীকালে বৈদিক দেবী সরস্বতীর অন্য পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি কেবল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতীর সঙ্গে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্বের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী।

সরস্বতী রানী পাল
গবেষক

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

পরিচিতি

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা প্রাথমিকভাবে মতিঝিলে একটি পাবলিক লাইব্রেরি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৯৩ সালে এটিকে ধানমন্ডিতে স্থানান্তর করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ২০১৭ সালে ধানমন্ডিতে ফিরে যাওয়ার আগে ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরিকে কয়েক বছরের জন্য গুলশান-এ স্থানান্তর করা হয়। লাইব্রেরিটি ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞান ও তথ্য প্রচারের জন্য ভারতীয় হাই কমিশনের একটি বাতায়ন হিসাবে কাজ করে আসছে।

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা ভারতের কয়েকটি বৃহৎ মিশন লাইব্রেরির মধ্যে একটি যা বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, বিদূষী, লেখক, চিন্তাবিদ, সরকারি গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষকে সেবা দিয়ে থাকে।

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি, হাউস নং-২৪ রোড নং-২ ধানমন্ডি, ঢাকায় অবস্থিত এবং রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত।

লাইব্রেরির পরিষেবাসমূহ

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঢাকার সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদান করে আসছে। এই লাইব্রেরির সংগ্রহে ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি, সমাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিষয়ে ২৫,০০০টিরও বেশি বই রয়েছে। লাইব্রেরিতে হিন্দি ও বাংলা ভাষার বইয়ের ভালো সম্ভার রয়েছে। এই লাইব্রেরিতে এনসাইক্লোপিডিয়া, অভিধান, হ্যান্ডবুক ও ইয়ারবুকের মতো রেফারেন্স বইও বিদ্যমান। ইংরেজি ও বাংলায় জনপ্রিয় ভারতীয় ও বাংলাদেশি সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনও রেফারেন্স হিসেবে এবং পড়ার জন্য রাখা হয়।

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা ভারতের একটি রেফারেন্স লাইব্রেরি হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিগতভাবে বা ফোন ও ই-মেইলে প্রাপ্ত রেফারেন্স প্রশ্নের উত্তর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। আগ্রহী ব্যবহারকারীরা এই ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন : lib.dhaka@mea.gov.in

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ভারত বিচিত্রা (মাসিক) প্রতি মাসে লাইব্রেরির সদস্য ও দর্শনার্থীদের কাছে বিতরণ করা হয়।

সদস্যপদের জন্য যা যা প্রয়োজন

লাইব্রেরি থেকে বই নেওয়ার জন্য লাইব্রেরির সকল সদস্যকে মেম্বারশিপ কার্ড (অ-হস্তান্তরযোগ্য) প্রদান করা হয়। ১৪ দিনের জন্য বই দেওয়া হয়। সদস্যপদ সকলের জন্য উন্মুক্ত যেখানে প্রয়োজন পড়ে :

* পূরণকৃত আবেদন ফর্ম (অনলাইন ও লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়)
* সম্প্রতি তোলা দুই কপি ছবি (পাসপোর্ট সাইজ একটি ও স্ট্যাম্প সাইজ একটি)
* পাসপোর্ট/ন্যাশনাল আইডি কার্ড/নাগরিকত্ব সনদপত্র/জন্ম সনদের ফটোকপি।
* ১০০০/- টাকার ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট
* সদস্যপদের আবেদন ফর্ম: https://www.hcidhaka.gov.in/pdf/Form_membership_dhaka_17jan23_NN1.pdf

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি

হাউস নং-২৪, রোড নং-২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

ফোন নম্বর : +৮৮০২-৯৬১২৩২২, ইমেল : lib.dhaka@mea.gov.in

বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল গ্যালারি

ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এনই (কে), ১৪, ১৮০, গুলশান অ্যাভেনিউ, ঢাকা

ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী (বাপু) এবং বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই দুই কালজয়ী ব্যক্তিত্বকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে গুলশানস্ত ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল গ্যালারি। ৭ ডিসেম্বর ২০২৩-এ মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ যৌথভাবে এই গ্যালারির শুভ উদ্বোধন করেন।

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।